POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاٰيٰتِ
رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ؕ رَبَّنَآ اَفْرِغْ
عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ○

এবং তুমি আমাদের উপর শুধু এই জন্য প্রতিশোধ লইতেছ যে, আমরা আমাদের প্রভুর আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনিয়াছি, যখন ঐগুলি আমাদের নিকট আসিল। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে ধৈর্য দান কর এবং আমাদিগকে আত্ম-সমর্পণকারী অবস্থায় মৃত্যু দাও।'

(আল আরাফ: ১২৭)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلّي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 10

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 43-44

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 23-30 Oct, 2025 30 রবিউস সানি-7 জামাদিউল আওয়াল 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

উত্তম আচরণ

* হযরত রসূলে পাক (সা.) বলেছেন, তুমি কখনো অর্থের দ্বারা মানুষকে বিত্তশালী করতে পারবে না। সুতরাং তুমি তাদের প্রফুল্ল বদনে ও উত্তম চরিত্র দ্বারা বিত্তশালী কর।"

(রিসালা কাশিরীয়া, বাবুল খুল্‌ক)

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, "যে কেউ এ দুনিয়াতে কোন মু'মিনের দুঃখ মোচন করবে আল্লাহ্ তাআলা শেষ বিচারের দিন তাকে ক্লেশমুক্ত করবেন। যে কেউ সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তির সমস্যাকে সমাধান করে- আল্লাহ্ তাআলাও তার ইহজগত ও পরজগতের সমস্যাকে সমাধান করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটিকে ঢেকে দেয় আল্লাহ্ তাআলাও ইহজগত এবং পরজগতে তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে দিবেন। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাহায্য সহযোগিতায় রত থাকে, আল্লাহ্ তাআলাও সেই বান্দার সাহায্য সহযোগিতায় রত থাকেন। যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের পথে চলে আল্লাহ্ তাআলাও তার জান্নাতের পথকে সহজ করে দেন। যারা আল্লাহ্ তাআলার কিতাব পাঠ করার জন্য আল্লাহ্ তাআলার ঘরে সমবেত হয় এবং একে অপরকে তা শিক্ষা দেয় নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা তাদের ওপর শান্তি বর্ষণ করেন, তারা আল্লাহ্‌র রহমতে আচ্ছাদিত হয়ে যায়, এবং ফিরিশ্‌তারা তাদের পরিবেষ্টন করে রাখে এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদের ঐ সকল লোকদের সাথে স্মরণ করেন, যারা তার নৈকট্য প্রাপ্ত। যে ব্যক্তিকে তার কর্ম পিছনে ফেলে দিয়েছে তার বংশ-গৌরব তাকে অগ্রগামী করবে না।"

(মুসলিম, কিতাবুয্ যিক্‌র)।

'ওরা খেলাধুলা শেষ করে শিগগিরই ফিরে আসবে, কিন্তু আমি সেই ক্রিকেট খেলছি যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।"

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

অগ্রগতি অসীম

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন:

"জান্নাতেও মুমিনগণ তাদের আধ্যাত্মিক অবস্থায় ক্রমাগত উন্নতি করে চলেন, এবং অগ্রগতি নবীগণের জন্যও নির্ধারিত আছে; অন্যথায় কেনই বা আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে আমরা তাঁদের জন্য দরূদ শরীফ পাঠ করব? আমাদের বিশ্বাস এই যে অগ্রগতি অসীম।"

মহানবী (সা.)-এর মহান কীর্তি

তিনি আরও বলেন:

"মানুষ বৃথা প্রাণপাত করে হযরত ঈসা (আ.)-কে অত্যন্ত দীর্ঘ জীবন আরোপ করতে। অথচ তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনে এমন কী ফলপ্রসু কাজ সংঘটিত হয়েছিল যে তাঁর জন্য অনন্ত জীবন কামনা করা হবে? পৃথিবী ক্রুশ পুজায় পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, এবং সর্বত্র 'শিরক' তথা বহু-ঈশ্বরবাদ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রকৃতপক্ষে, যদি কারও পক্ষে এমন দীর্ঘ জীবন লাভ করা সম্ভব হতো, তবে তার প্রকৃত দাবিদার ছিলেন পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.), যিনি অতি স্বল্প কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীকে একেশ্বরবাদীদের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তুলেছিলেন এবং তাদের হৃদয়ে সৃষ্টিকর্তার প্রতি সত্যিকারের প্রেমের আগুন প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন।"

যে ক্রিকেট খেলা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে

একদিন কাদিয়ানের তালীমুল-ইসলাম স্কুলের ছাত্ররা একটি ক্রিকেট ম্যাচে মগ্ন ছিল। কিছু প্রবীণ ব্যক্তিও শিশুদের আনন্দ বাড়ানো জন্য মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ দৃশ্য দেখে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর এক পুত্র, শিশুসুলভ সারল্যে, তাঁকে বলল, 'আব্বা, আপনি কেন ক্রিকেট খেলায় যান নি?" সেই সময় প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) সূরা ফাতিহা-এর ব্যাখ্যা লেখায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন:

'ওরা খেলাধুলা শেষ করে শিগগিরই ফিরে আসবে, কিন্তু আমি সেই ক্রিকেট খেলছি যা কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।" (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৯৩,৯৪)

ইসলাম ঘোষণা করে যে, সেই উদ্দেশ্যটি হল, মানুষকে চিরন্তন জীবনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং তার জন্য অবিরাম আত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। পরলৌকিক জীবনের প্রতি বিশ্বাসই এমন একটি উপাদান যা মানুষের অন্তরে খোদাভীতি ও ঐশী প্রেম সৃষ্টি করে এবং তার চরিত্র ও কর্মের সংশোধনের এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা মোমেনের ৩৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন:

আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে- "আমাদের জীবন তো কেবল এই পার্থিব জীবনই; আমরা মরি ও বাঁচি, এবং আমরা কখনো পুনরুত্থিত হব না।" এই ঘোষণার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা এবিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, নবীগণের প্রতি অবিশ্বাসীদের অস্বীকারের অন্যতম প্রধান কারণ হল মৃত্যুর পর পুনরুত্থান সম্পর্কে তাদের অস্বীকৃতি। এই বিশ্বাসের ফলেই তারা কখনো নিজেদের কাজের নৈতিক মূল্য- তা সৎ হোক বা অসৎ- সম্পর্কে প্রকৃত সচেতনতা অর্জন করতে পারে না। তারা যে পথে চলতে শুরু করে, সেই পথেই অন্ধভাবে চলতে থাকে এবং মনে করে যে, জীবনের উদ্দেশ্য কেবল খাওয়া, পান করা এবং এই কয়েকদিনের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে ভোগ-বিলাসে কাটিয়ে দেওয়া।

অতএব, যখন আল্লাহ্‌র নবীগণ তাদের কাছে তাঁর বার্তা নিয়ে আগমন করেন এবং তাদের বিশ্বাস ও আচরণের মধ্যে এক গভীর পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন, তখন তারা একপ্রকার ধাক্কা অনুভব করে। তারা প্রতিবাদ করে বলতে শুরু করে, "তোমরা কেন আমাদের আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় দেখাও? আমরা তো মোটেই বিশ্বাস করি না যে মৃত্যুর পর আমরা পুনরায় জীবিত হব। অতএব, আমাদের জবাবদিহিতার ভয়ই বা কেন থাকবে? আমরা যা কিছু করি, তা এই স্বল্পস্থায়ী পার্থিব জীবনের জন্যই করি, এবং আমরা যথেষ্ট সক্ষম আমাদের লাভ-ক্ষতি বুঝতে। সুতরাং, আমাদের পরকালীন শাস্তির ভয় দেখিও না।"

বাস্তবিক অর্থে, মৃত্যুর পর জীবনের প্রতি বিশ্বাসই এমন একটি উপাদান যা মানুষের অন্তরে খোদাভীতি ও ঐশী প্রেম সৃষ্টি করে এবং তার চরিত্র ও কর্মের সংশোধনের এক শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। যদি পরকালীন জীবনের প্রতি বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে কেবল সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই অর্থহীন ও নিষ্ফল স্বীকার করতে হবে না, বরং ন্যায়পরায়ণতা ও তাকওয়ায় অগ্রসর হওয়াও একটি নিরর্থক প্রচেষ্টা বলে প্রতীয়মান হবে।

নিঃসন্দেহে, এই ধারণা যে আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, আকাশ, পৃথিবী এবং এদের মধ্যবর্তী অসংখ্য বস্তু সৃষ্টি করেছেন- যার প্রতিটিতে তাঁর ক্ষমতার অসংখ্য নিদর্শন নিহিত রয়েছে- আর তারপর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কেবল এজন্য যে সে অল্প কয়েক বছর বাঁচবে এবং চিরতরে বিনষ্ট হয়ে যাবে কোন উদ্দেশ্য ব্যতীত- এমন চিন্তাকে কোন সুস্থ বুদ্ধি গ্রহণ করতে পারে না। মানুষের জন্য এমন সুবিশাল মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং তাকে প্রদত্ত বুদ্ধি যার দ্বারা

(শেষাংশ শেষ পৃষ্ঠায়.....)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) হাকিম বিন হাযামকে প্রথমে একশ উট প্রদান করেন, অতঃপর তার আবেদনে আরও দুশটি উট প্রদান করেন এবং বলেন:

হে হাকীম! এই সম্পদ উত্তম এবং সুমিষ্ট; উত্তম সম্পদ। কেউ এগুলো বিনা লোভে গ্রহণ করলে এতে সমৃদ্ধি থাকবে, আর কেউ এগুলো লোভের বশবতী হলে নিলে পরে এতে সমৃদ্ধি হবে না। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়– যে খাবার খায় ঠিকই, কিন্তু তৃপ্তি পায় না। ওপরের হাত অর্থাৎ দানকারী হাত নীচের হাত অর্থাৎ গ্রহণকারী হাত থেকে উত্তম হয়ে থাকে।

পূর্ববতী সেই ঐশী সাহায্যের দৃশ্যাবলির দৃষ্টিকোণ থেকে তায়েফ জয় করাও বড়ো কোনো কষ্টসাধ্য ও অসম্ভব বিষয় ছিল না। কিন্তু মহানবী (সা.) এই বাহ্যত পরাজয় স্বীকার করে নেন এবং অবরোধ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। প্রকৃতপক্ষে (এর মাধ্যমে) মহানবী (সা.)–এর জীবনীর উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় একটি দিক আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয় আর তা হলো, মহানবী (সা.)–এর এই যুদ্ধাভিযানও প্রকৃতপক্ষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল না, গনিমতের সম্পদ লাভ বা সাম্রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং মহানবী (সা.)–এর প্রতিটি গতি ও স্থিতি এবং প্রতিটি কথা ও কাজ সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছাধীন ছিল।

কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সহনশীলতা ও দয়া এত পরম মার্গে উপনীত ছিল যে, বাহ্যত তিনি নিজ লক্ষ্য পূরণ না করেই ফেরত যাচ্ছিলেন, তথাপি তিনি (সা.) তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়ার পরিবর্তে এই দোয়া করেন: اَللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا وَاْتِ بِهِمْ مُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি সাকীফ গোত্রকে হিদায়াত দাও এবং তাদেরকে মুসলমান হিসেবে আমাদের কাছে নিয়ে এসো।

মহানবী (সা.) কুরাইশকে মালে গনিমত প্রদানের প্রজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, إِنِّيْ أُعْطِيْ قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ لِأَنَّهُمْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ অর্থাৎ আমি কুরাইশকে প্রদান করে তাদের মনোস্তুষ্টির ব্যবস্থা করছি। কেননা কুফরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের তাদের এখনো বেশি দিন হয় নি, অর্থাৎ তাদের ঈমান এখনো এতো দৃঢ় হয় নি।

হুনাইনের যুদ্ধের পর আপত্তিকারী এক মুনফিক সম্পর্কে সাহাবীগণ বলেন:

"হে আল্লাহ্র রসূল(সা.)!এক ব্যক্তি যদি বাইরে এক রকম প্রকাশ করে, অথচ তার হৃদয়ের চিত্র আরেক রকম হয়–এমন ব্যক্তি কি তবে শাস্তিযোগ্য নয়?"

মহানবী (সা.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা এমন আদেশ দেন নি যে, আমি মানুষের অন্তরের ধারণা অনুযায়ী তাদের সাথে ব্যবহার করব। বরং আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন মানুষের সাথে তাদের বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার করি।"

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, এর জুমআর খুতবা (১৯ তবুক, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পূর্ববতী খুতবাসমূহে তায়েফের যুদ্ধের আলোচনা হচ্ছিল। এই উপলক্ষ্যে একজন সাহাবী, যিনি তাদের সাথে কথা বলার জন্য গিয়েছিলেন এবং তায়েফবাসীরা তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও দিয়েছিল যে, তার কোনো ক্ষতি করা হবে না; তা সত্ত্বেও যখন তিনি দুর্গের কাছে যান তখন তাকে শহীদ করে দেওয়া হয় এবং তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। কিন্তু তায়েফবাসীদের এই চুক্তি ভঙ্গ করা সত্ত্বে ও মহানবী (সা.) সন্ধির চেষ্টা পরিত্যাগ করেন নি। তিনি (সা.) পুনরায় হযরত হানযালা বিন রবী–কে তায়েফবাসীদের কাছে পাঠান। যখন তিনি দুর্গের কাছে পৌঁছেন এবং আলোচনার বার্তা পাঠান, তখন তাদের কিছু লোক আলোচনার জন্য বাইরে আসে আর হযরত হানযালা বলেন, তোমরা সন্ধি চাও, নাকি চাও না? তারা কিছু বলার পরিবর্তে হযরত হানযালার ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে ধরে দুর্গের ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে থাকে। এতে মহানবী (সা.) বলেন, কে আছে যে হানযালাকে উদ্ধার করে আনবে? যে তাকে নিয়ে আসবে তাকে আমাদের সমস্ত মুজাহিদের সমান সওয়াব ও পুরস্কার দেওয়া হবে। এতে হযরত আব্বাস দৌড়ে যান এবং মুশরিকদের হাত থেকে হযরত হানযালাকে উদ্ধার করে আনেন। ফেরার পথে শত্রুরা দুর্গ থেকে পাথরও নিক্ষেপ করে, কিন্তু তারা কাফিরদের এই পাথর নিক্ষেপ থেকে নিরাপদ থাকেন।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৫২–৩৫৩]

যেমনটি পূর্বের খুতবাগুলোতে বর্ণিত হয়েছে, তায়েফ ও হাওয়াযিনের লোকদের মক্কাবাসীদের সাথে এবং বিশেষত কুরাইশের সাথে পারিবারিক ও নিবিড় অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল।এছাড়া পরস্পরের সাথে বিবাহের কারণেও সম্পর্ক ছিল। এই কারণে সন্ধির জন্য হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারব এবং হযরত মুগীরা বিন শু'বা দুর্গের ভেতর যান, কিন্তু তারাও সফল হন নি। তবে দুর্গবাসীরা এই অনুরোধ করে যে, মুহাম্মদ (সা.)–কে বলুন, তিনি যেন আমাদের বাগানের ক্ষতি না করেন। আল্লাহ্র ওয়াস্তে ও আত্মীয়তার সম্পর্কের খাতিরে সেগুলো যেন সেভাবেই রেখে দেওয়া হয়। তারা নিজেরা কোনো চুক্তি মানতে রাজি নয়, কিন্তু অনুরোধ করছে যে, তাদের ওপর যেন কৃপা করা হয়। এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি (সা.) তাদের অনুরোধে তাদের বাগান কর্তন করার আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৫৮–৩৫৯]

মহানবী (সা.)–এর চরিত্রের একটি অনন্য দিক হলো, তিনি এত উচ্চমানের ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রমাণ দিয়েছেন যে, তিনি বেশ কিছুদিন যাবৎ তাদের অবরোধ করে রেখেছিলেন আর এটি এমন একটি যুদ্ধকৌশল ছিল যার ফলে যুদ্ধের পাল্লা মুসলমানদের দিকে ঝুঁকে যেতে পারত; অর্থাৎ যদি বাগান কাটার আদেশ দেওয়া হতো– তাহলে। কিন্তু যখন তারা আল্লাহ্র দোহাই ও আত্মীয়তার সম্পর্কে র দোহাই দেয়, তখন তিনি (সা.) তাদের অনুরোধ গ্রহণ করেন এবং বাহ্যত যুদ্ধের ক্ষেত্রে একটি বড়ো ক্ষতি মেনে নেন।

এসময় মহানবী (সা.) ঘোষণা করান, যে ক্রীতদাস দুর্গের প্রাচীর ডিঙিয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে তাকে মুক্ত গণ্য করা হবে। এতে তেইশজন ক্রীতদাস নেমে এসে মুসলমানদের সাথে যোগ দেয়। তায়েফবাসীরা এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। তিনি (সা.) তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন। তাদের প্রত্যেককে তিনি (সা.) একেকজন মুসলমানের তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেন এবং তার ভরণপোষণের দায়িত্ব সেই মুসলমানের ওপর অর্পণ করেন। (শারাহ যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১-১৩) (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৪)

মহানবী (সা.) এই দাসদের সম্পর্কে এ উপদেশও দেন, তাদেরকে যেন ভালোভাবে ধর্ম শেখানো হয়। কিছুকাল পর যখন তায়েফবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তখন তারা তাদের এই দাসদের কথাই উল্লেখ করেছিল এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে অনুরোধ করেছিল ,আমাদের দাসদের আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এতে তিনি (সা.) তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এই দাসদের মধ্যে কয়েকজন ইসলামের ইতিহাসে পুণ্য ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছেন, যাদের মধ্যে একজন হযরত আবু বাকরাও ছিলেন। (গাযওয়ায়ে হুনাইন, প্রণেতা-বাশমীল, পৃ: ২৩৫-২৩৬)

(অবরোধের) এক পর্যায়ে উয়াইনা বিন হিসন ফাযারী মহানবী (সা.)-এর কাছে অনুমতি চায়, সে দুর্গের ভেতরে গিয়ে বনু সাকীফকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাবে। উয়াইনা বিন হিসনের পরিচয় হলো, সে আহযাবের যুদ্ধের সময় কাফিরদের পক্ষ থেকে বনুফাযারার সর্দার ছিল। আহযাবের যুদ্ধে কাফিরদের পরাজয়ের পরেও সে মদীনায় আক্রমণ করার সংকল্প করেছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা.) শহর থেকে বের হয়ে তার আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন এবং তাকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিলেন। সে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তাতে অংশগ্রহণও করেছিল। মক্কা বিজয়ের সময় সে বাহ্যত মুসলমান ছিলআর হুনাইন ও তায়েফের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-র খিলাফতকালে বিদ্রোহী মুরতাদদের সাথে সে-ও ধর্মত্যাগের নৈরাজ্যের শিকারে পরিণত হয় এবং ভণ্ড নবী ও বিদ্রোহী তুলাইহার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার বয়আত করে এবং তার সাথে মিলে ইসলামী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আর যখন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে বন্দি অবস্থায় হযরত আবু বকরের সামনে উপস্থিত হয়, তখন সে অনুশোচনা প্রকাশ করে। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে ক্ষমা করে দেন এবং সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে আর তখন সে এ-ও বলেছিল, এর পূর্বে সে কখনো প্র কৃত অর্থে ঈমান আনে নি। তার সম্পর্কে লেখা আছে,সে রুক্ষ স্বভাবের ও বদমেজাজি লোক ছিল, নিজ গোত্রের বিখ্যাত যোদ্ধা ও সর্দার ছিল। তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) তাকে "আল-আহমাকু মুতা'" আখ্যা দিয়েছিলেন,অর্থাৎ এমন নেতা ও পথপ্রদর্শক যে আহাম্মক বা মূর্খ।

যাইহোক, যখন সে বলে, আমি যাব- তখন মহানবী (সা.) তাকে অনুমতি প্রদান করেন। এরপর উয়াইনা দুর্গে সেই লোকদের কাছে পৌঁছে এবং ইসলামের দাওয়াত দেবার পরিবর্তে বনু সাকীফকে বলতে থাকে, তোমরা দৃঢ়তার সাথে তোমাদের দুর্গে অটল থাকো, কারণ আমাদের অবস্থা একজন দাসের চেয়েও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এক বর্ণনায় এই শব্দও রয়েছে যে, দেখো! কোনো অবস্থাতেই তোমাদের দুর্গ ছেড়ো না এবং কোনো কথায় প্রভাবিত ও চিন্তিত হয়ো না। উয়াইনা যখন আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর কাছে ফিরে আসে তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, উয়াইনা! তুমি তাদের কী বলেছিলে? সে বলে, আমি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের উপদেশ দিয়েছি এবং ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, জাহান্নামের ভয় দেখিয়েছি এবং জান্নাতের পথ দেখিয়েছি। অথচ আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে ওহীর মাধ্যমে এ বিষয়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন, সে সেখানে কী বলে এসেছে। অতএব তিনি (সা.) বলেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি তাদের এই এই কথা বলেছ,এবং তিনি (সা.) উয়াইনার সেই সমস্ত কথা পুনরাবৃত্তি করেন যা সে সেখানে বলেছিল। এটি শুনে উয়াইনা অবাক হয়ে যায় আর বলে, হে আল্লাহ্ র রসূল (সা.)! আপনি সত্য বলেছেন। আমি আমার এই কাজের জন্য আপনার কাছে ও আল্লাহ্ তা'লার কাছে তওবা করছি।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৮, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৬) (আল ইসতিয়াব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৭) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৬০-৩৬১]

কিন্তু যাইহোক, তার ঈমান তখনও পূর্ণতা পায় নি।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম, যে তার পরিবারের কছে উত্তম এবং আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক উত্তম।" (আবু দাউদ)।

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa Sb., Berhampur, Murshidabad

মহানবী (সা.) অবরোধের পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে হযরত নওফেল বিন মুআবিয়া দেহলীর সাথে পরামর্শ করেন। তিনি নিবেদন করেন, এটি তেমনই (পরিস্থিতি) যেমনটি শেয়াল তার গর্তে ঢুকে থাকে। এর ওপর দাঁড়িয়ে থাকলে সেটিকে ধরা যাবে, আর ছেড়ে দিলেও সেটি ক্ষতি করার শক্তি রাখে না; অর্থাৎ শেয়াল যেভাবে নিজের গর্তে চলে যায়। একথা শুনে মহানবী (সা.) অবরোধ তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং হযরত উমরের মাধ্যমে লোকদের মাঝে ঘোষণা করান, ইনশাআল্লাহ্, আগামীকাল প্রত্যাবর্তন হবে।

(তারিখে তাবারি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৭২) (আররাহিকুল মখতুম, পৃ: ৫৬৮)

মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে শুধু এই পরামর্শের কারণে নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেও তিনি (সা.) কোনো বিশেষ নির্দেশনা বা ইঙ্গিত পেয়েছিলেন; তাই তিনি (সা.) এই অবরোধ প্রত্যাহার করেন। অন্যথায় তাঁর (সা.) যুদ্ধাভিযানসমূহের মাঝে এমন ঘটনাপ্রথমবার ঘটেছিল ছিল যে, বাহ্যত খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় বিজয়কে দৃশ্যত অসম্পূর্ণ রেখে তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন।

বিশ্লেষকগণ এবং বর্ণনাকারীরা যা লিখেছেন আর আমরা ইতিহাসেও দেখেছি, এর চেয়েও অধিক কষ্টকর ও দুঃসাধ্য যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে অসাধারণ বিজয় ও সাহায্যে ভূষিত করেছিলেন। বনু কুরায়যা এবং খায়বারের বিজয়সমূহ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। হুনাইনের ঘটনাও তখন সদ্য দেখা একটি দৃষ্টান্ত ছিল;সেটি কীভাবে বিস্মৃত হতে পারে? কতিপয় মক্কাবাসীও হুনাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর পরাজয়ের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। তাদের মাঝে একটি দল তো মহানবী (সা.)-এর পরাজয়ের দৃশ্যের মজা দেখতেই সঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তেও নিশ্চিত এক পরাজয়কে আল্লাহ্ তা'লা বিস্ময়কর, অসাধারণ এবং ঐতিহাসিক বিজয়ে রূপান্তরিত করেছিলেন। আর তায়েফে তো সেই পলাতক ও পরাজিত সৈন্যদলই আশ্রয় নিয়েছিল এবং ভীতত্রস্ত হয়ে গুটিসুটি মেরে বসে ছিল। পূর্ববর্তী সেই ঐশী সাহায্যের দৃশ্যাবলির দৃষ্টিকোণ থেকে তায়েফ জয় করাও বড়ো কোনো কষ্টসাধ্য ও অসম্ভব বিষয় ছিল না। কিন্তু মহানবী (সা.) এই বাহ্যত পরাজয় স্বীকার করে নেন এবং অবরোধ প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। প্রকৃতপক্ষে (এর মাধ্যমে) মহানবী (সা.)-এর জীবনীর উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয় একটি দিক আমাদের সামনে পরিস্ফুট হয় আর তা হলো, মহানবী (সা.)-এর এই যুদ্ধাভিযানও প্রকৃতপক্ষে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল না, গনিমতের সম্পদ লাভ বা সাম্রাজ্য জয়ের উদ্দেশ্যে ছিল না; বরং মহানবী (সা.)-এর প্রতিটি গতি ও স্থিতি এবং প্রতিটি কথা ও কাজ সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছাধীন ছিল। আর মহানবী (সা.)-এর পুরো জীবন এই আয়াতটির সত্যায়নকারী ছিল- قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (সূরা আনআম: ১৬৩) তুমি তাদের বলো, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ আল্লাহ্‌র জন্যই- যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক-প্রভু ।

তায়েফ অবরোধের সময় এমন দুটি ঘটনা ঘটেছে যার ফলে স্পষ্টত জানা যায়, মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই দিকনির্দেশনা লাভ করেছিলেন যে, এই অবরোধ প্রত্যাহার করা হোক। তাই তিনি (সা.) অনতিবিলম্বে অবরোধ প্রত্যাহারের ঘোষণা প্রদান করেন। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সা.)-এর একটি স্বপ্নের উল্লেখও পাওয়া যায়। ইবনে হিশাম লিখেছেন, তায়েফ অবরোধের সময় মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, হে আবু বকর! আজ আমি স্বপ্নে দেখেছি, মাখনে পরিপূর্ণ একটি পাত্র আমার কাছে উপহারস্বরূপ এসেছে। এরপর একটি মোরগ ঠোকর দিয়ে সেই পাত্রটি ফেলে দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, আমার মনে হচ্ছে, এই দফায় আপনি সাকীফের অর্থাৎ সাকীফ গোত্রের কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করছেন তা লাভ করতে পারবেন না। [অর্থাৎ এই যে অবরোধ করা হয়েছে- এর পরিণাম তা হবে না যা আমাদের পক্ষে আসবে, যা আমরা ভেবেছিলাম। বিজয় অর্জন কষ্টসাধ্য মনে হচ্ছে।] মহানবী (সা.) বলেন, আমারও মনে হচ্ছে, এখনকার মতো (কাঙ্ক্ষিত বিজয়) সেভাবে লাভ করা সম্ভব নয়।

(সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৯৩) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৬]

অনুরূপভাবে একটি রেওয়ায়েতে এ-ও বর্ণিত হয়েছে যে, খওলা বিনতে হাকীম-[তার নাম খুয়ায়লাও বর্ণি ত হয়েছে;] তিনি হযরত উসমান বিন মাযউন (রা.)-র স্ত্রী ছিলেন, তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আল্লাহ্ তা'লা যদি আপনাকে তায়েফ বিজয়ে ধন্য করেন তাহলে বাদিয়া বিনতে গিলান অথবা ফারিয়া বিনতে আকীলের অলঙ্কার আমাকে দান করবেন, কেননা সমগ্র সাকীফে এই নারীদের সমতুল্য অন্য কোনো নারীর কাছে এতো মূল্যবান অলঙ্কার নাই। মহানবী

(সা.) তাকে বলেন, হে খওলা! সাকীফের ওপর বিজয় লাভ করার অনুমতিই যদি আমাকে না দেওয়া হয়– তখন কী হবে? হযরত খওলা সেখান থেকে বের হয়ে হযরত উমর (রা.)-র কাছে গিয়ে এ কথাগুলো বলেন। হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! খওলা কী ধরনের কথাবার্তা বলছে! আর সে বলছে, একথা আপনি তাকে বলেছেন। তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, আমি একথা বলেছি। হযরত উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ বুঝে যান এবং নিবেদন করেন, তাদের ব্যাপারে কি আপনাকে অনুমতি প্রদান করা হয় নি;এই বিজয় সম্পর্কে অথবা এই যুদ্ধ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে? তিনি (সা.) বলেন, না। হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, তাহলে কি আমি লোকদের ফিরে যাবার জন্য বলব? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ। সুতরাং অনুমতি লাভ করার পর হযরত উমর (রা.) সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৭)

যখন প্রত্যাবর্তনের ঘোষণা দেওয়া হলো তখন কেউ কেউ মত প্রকাশ করল, আমরা বিজয় ছাড়াই কেন ফিরে যাচ্ছি? হতে পারে, এটি কিছু তরুণ যুবকের প্রতিক্রিয়া ছিল। প্রথমে তারা হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.)-র সমীপে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করে, তঁ ারা যেন মহানবী (সা.)-কে বিজয় না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তারা উভয়ে উত্তর দেন, মহানবী (সা.) যে সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন–সেটাই সঠিক। হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) তাদের এই কথা উপস্থাপন করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন এসব আবেগপ্রবণ যুবক নিজেরাই মহানবী (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত আবেগময় ভঙ্গিতে অনুরোধ করে, হুযূর, আমরা যুদ্ধ করব! মহানবী (সা.) তখন তাদের ইচ্ছার প্রেক্ষিতে বলেন, ঠিক আছে, আগামীকাল সকালে যুদ্ধ করো। পরদিন যখন তারা যুদ্ধের জন্য বের হয় তখন আঘাত ছাড়া আর কিছুই অর্জন করতে পারে নি। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমরা ইনশাআল্লাহ্‌ আগামীকাল ফিরে যাব। [অর্থাৎ যুদ্ধ করে কোনো লাভ হয় নি, কেবল আহত হয়ে তারা ফিরে আসে।] তখন তারাও সবাই খুশি হয়, আর মহানবী (সা.) তাদের মতের পরিবর্তন দেখে স্মিত হাসেন।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৭-৩৬৮] (শারাহ যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৩-১৪)

এই যুদ্ধে কাফিরদের তিনজন নিহত হয়। তবে তাদের আহত এবং আরো যারা নিহত হয়েছে, তাদের বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায় না, কেননা তারা দুর্গের ভেতরেই অবস্থানরত ছিল। একইভাবে আহত মুসলমানদের সংখ্যাও নির্দিষ্টভাবে জানা যায় না, তবে কিছু আহতের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। মুশরিকদের তির বর্ষণের ফলে আহতের মাঝে হযরত সুফিয়ান বিন হারব (রা.)-র কথা জানা যায়। একটি তির তার (রা.) চোখে এসে লাগে, ফলে তার (রা.) চোখটি বাহিরে বের হয়ে আসে। তিনি (রা.) তার সেই চোখটি হাতে নিয়ে সোজা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর নিকটে আসেন। তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার এই চোখ আল্লাহ্‌র পথে উৎসর্গিত হতে যাচ্ছে। মহানবী (সা.) তখন বলেন, তুমি যদি চাও তাহলে আমি দোয়া করব আর তোমার এই চোখ ঠিক হয়ে নিজ স্থানে লেগে যাবে। আর তুমি যদি চোখ না চাও তাহলে তোমার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হবে। অন্য একটি বর্ণনায় এই শব্দ আছে, যদি 'আইন' অর্থাৎ চোখ না চাও তাহলে জান্নাতে তোমাকে 'আইন' অর্থাৎ (আল্লাহ্‌র) কৃপারাজির ঝরনা প্রদান করা হবে। আরবী ভাষায় 'আইন' শব্দের একটি অর্থ চোখ, আবার ঝরনাকেও 'আইন' বলা হয়। আবু সুফিয়ান তখন বলেন, আমার কাছে জান্নাতই অধিক প্রিয়। এ কথা বলেই তিনি নিজের হাত থেকে চোখটি ফেলে দেন। ইনিই সেই আবু সুফিয়ান– যিনি মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং উহুদের যুদ্ধে কাফির বাহিনীর সেনাপতিও ছিলেন। এখন মুসলমান হওয়ার পরও তিনি কুরবানীর ক্ষেত্রে সম্মুখসারিতে ছিলেন। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, তার অপর চোখটিও ইয়ারমুক যুদ্ধে নষ্ট হয়ে যায়।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্‌ (সা.), ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৩] (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৪)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "ঐ তা'মে ওলীমাহ (বিবাহ ভোজ) সবচেয়ে নিকৃষ্ট যাতে শুধুমাত্র ধনীরাই আমন্ত্রিত হয় এবং দরিদ্রদের বাদ দেওয়া হয়। সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌ এবং তাঁর রসূলের অবাধ্য, যে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে।" (মুসলিম, কিতাবুন্‌ নিকাহ্‌)।

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From- Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

একইভাবে আরেকজন সাহাবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি হলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-র পুত্র আব্দুল্লাহ্‌। তার ক্ষত এত দীর্ঘকাল স্থায়ী ও প্রাণঘাতী সাব্যস্ত হয় যে, শেষ পর্যন্ত তার পিতা হযরত আবু বকর (রা.)-র খিলাফতকালে এই আঘাতের ফলেই তার মৃত্যু হয়।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৯)

এই যুদ্ধে বারোজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তাদের নামগুলো হলো: হযরত সাঈদ বিন আস (রা.), হযরত উরফাতা বিন জানাব (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন আবি উমাইয়া (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন আমের (রা.), হযরত সায়ের বিন হারেস (রা.) ও তার ভাই আব্দুল্লাহ্‌ বিন হারেস (রা.), হযরত জুলাইহা বিন আব্দুল্লাহ্‌ (রা.), হযরত সাবেত বিনজাযা (রা.), হযরত হারেস বিন সাহল (রা.), হযরত মুনযের বিন আব্দুল্লাহ্‌ (রা.), হযরত রুকাইম বিন সাবেত (রা.) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্‌ বিন আবু বকর (রা.), যিনি পরবর্তীতে ইন্তেকাল করেন। (সীরাত ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৯৪-৭৯৫)

এই যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে তার দুইজন পবিত্র সহধর্মিণী যথাক্রমে হযরত উম্মে সালমা (রা.) এবং হযরত যয়নব (রা.) ছিলেন। তাদের দুইজনের জন্য দুটি তাঁবু খাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মহানবী (সা.) অবরোধ চলাকালীন সেই দুই তাঁবুর মধ্যে নামায আদায় করতেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, লি ইবনে সাআদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২০)

মহানবী (সা.) কতদিন তায়েফ নগরীর অবরোধ করেছিলেন– সে বিষয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়।কেউ কেউ বলেন, দশ রাত বা তার চেয়ে কিছু বেশি রাত অবরোধ চলেছিল। ইবনে হিশাম বলেন, এটাও বলা হয় যে, সতেরো রাত অবরোধ করা হয়েছিল। আবার কারো কারো মতে, বিশ দিন অবরোধ চলেছিল। কিছু বর্ণনায় আছে, বিশ রাতেরও কিছু বেশি সময় ধরে অবরোধ করা হয়েছিল। একটি বর্ণনায় এসেছে, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) প্রায় ত্রিশ রাত পর্যন্ত তায়েফবাসীদের অবরোধ করেছিলেন। সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আমরা চল্লিশ রাত পর্যন্ত তাদের অবরোধ করেছিলাম। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৮) (সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, হাদীস-২৪৪২)

যাইহোক, যখন ফিরে যাওয়ার সময় এলো তখন রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) বলেন, এটি বলতে বলতে ফিরে চলো: آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ অর্থাৎ আমরা ফিরে যাচ্ছি, তওবা করছি, ইবাদত করছি এবং আমাদের প্রতিপালক-প্রভুর প্রশংসা করছি। লোকেরা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি বনু সাকীফের (তথা তায়েফবাসীদের) বিরুদ্ধে বদদোয়া করুন।

কিন্তু রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সহনশীলতা ও দয়া এত পরম মার্গে উপনীত ছিল যে, বাহ্যত তিনি নিজ লক্ষ্য পূরণ না করেই ফেরত যাচ্ছিলেন, তথাপি তিনি (সা.) তাদের বিরুদ্ধে বদদোয়ার পরিবর্তে এই দোয়া করেন: اَللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا وَأْتِ بِهِمْ مُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! তুমি সাকীফ গোত্রকে হিদায়াত দাও এবং তাদেরকে মুসলমান হিসেবে আমাদের কাছে নিয়ে এসো। এরপর যখন তিনি (সা.) বাহনে চড়ে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নেন তখন এ দোয়া করেন: اَللّٰهُمَّ اهْدِهِمْ وَاكْفِنَا مُؤْنَتَهُمْ অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌! তুমি তাদের হিদায়াত দাও এবং তাদের উপায় উপকরণ ও শক্তির মোকাবিলায় তুমি আমাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাও। কারণ রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর মূল উদ্দেশ্য ছিল দিশাহারা-পথভ্রষ্ট সৃষ্টিকুল যেন নিজ প্রতিপালক-প্রভুর দিকে ফিরে আসে। বস্তুত আল্লাহ্‌ তা'লা রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর এই দোয়া এমনভাবে কবুল করেন যে, এক বছরও পূর্ণ হয় নি– নবম হিজরীর রমযান মাসে তায়েফবাসীরা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে নেয়। (শারাহ যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫-১৮)

হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.)-ও এই বিষয়ে একটি স্থানে বলেন, রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) তায়েফ শহরের দিকে রওয়ানা হন; সেই শহর– যার অধিবাসীরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-কে পাথর মেরে শহর থেকে বের করে দিয়েছিল। তিনি (সা.) কিছুদিন সেই শহর অবরোধ করে রাখেন। কিন্তু যখন কিছু লোক পরামর্শ দিল যে, তাদের অবরোধ করে সময় নষ্ট করার প্রয়োজন নেই, কারণ পুরো আরবের মধ্যে একটি মাত্র শহর কী-ইবা করার সামর্থ্য রাখে– তখন রসূলু ল্লাহ্‌ (সা.) অবরোধ ভঙ্গ করে ফিরে যান, আর কিছুদিনের মধ্যেই তায়েফবাসীরাও মুসলমান হয়ে যায়।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৫৭)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সাবধান! দেহের মধ্যে একখন্ড মাংসপিন্ড আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা সুস্থ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত দেহই সুস্থ থাকে এবং যখন তা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে তখন সমস্ত দেহই অসুস্থ হয়ে পড়ে। মনে রেখো! তা হচ্ছে হৃদয়।" (মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Wasia Begum, Harhari, Murshidabad

হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদ বণ্টনের উল্লেখ আছে, ৫ই যিলকদ তারিখে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তায়েফ থেকে জিরানা আগমন করেন, যেখানে সমস্ত বন্দি ও গনিমতের সম্পদ একত্র করা হয়েছিল। রসূলু ল্লাহ্ (সা.)-এর নির্দেশে এই বন্দিদের প্রতি এমন সদ্ব্যবহার করা হয়েছিল যে, তাদের থাকার জন্য অস্থায়ী ঘরবাড়ি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল যেন তারা ঠাণ্ডা-গরমের কষ্ট থেকে রক্ষা পায়। (সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬৪০)

যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পদের বিবরণ হলো, প্রায় ছয় হাজার দাস-দাসী ছিল; তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিছু বর্ণনায় তাদের সংখ্যা আট হাজারও বর্ণনা করা হয়ে থাকে। [বর্তমানকালের যুদ্ধের মতো নয় যে, যারা শত্রুতা পোষণ করে, তারা নির্মিত বাড়িঘরও ধ্বংস করে দেয়, ধূলিসাৎ করে দেয়- যা বর্তমানে ইসরাঈলে হচ্ছে। বরং তিনি (সা.) তাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করিয়েছিলেন, যারা সংখ্যায় ছয় থেকে আট হাজার ছিল।] যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মাঝে চব্বিশ হাজার উট ছিল, চল্লিশ হাজারের বেশি ছাগল ও ভেড়া এবং চার হাজার উকিয়া রূপা- যার পরিমাণ প্রায় ৪৯০ কেজি। এর আগে মুসলমানদের হাতে কখনো এত বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আসে নি। এমন পরিস্থিতিতেও মহানবী (সা.) নিজ সাহাবীদের তরবিয়তের প্রতি এমন খেয়াল রাখেন যে, তিনি (সা.) গনিমতের ধনসম্পদ বণ্টনের পূর্বে ঘোষণা করেন, এই সম্পদের মাঝে খুমসের অংশ বাদে আমার অধিকারও ঠিক ততটুকুই, যতটুকু অধিকার তোমাদের প্রত্যেকেরই রয়েছে। আর এই খুমসের অংশও পরিশেষে তোমাদের কাছেই ফিরে আসবে। এরপর বলেন, ছুঁচ-সুতা অথবা এর থেকে ক্ষুদ্র বস্তুও যদি কারো কাছে থাকে তাহলে ফেরত দিয়ে দাও। অবিশ্বস্ততা থেকে বিরত থাকো, কেননা কিয়ামত দিবসে এই অবিশ্বস্ততা তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও কলঙ্কের কারণ সাব্যস্ত হবে। এই ঘোষণা শুনে এক সাহাবী উটের পশম দ্বারা তৈরি রশির পুটলি নিয়ে তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার ঘোড়ার ছেঁড়া জিন সেলাই করার জন্য এই সুতা গনিমতের সম্পদ থেকে নিয়ে নিয়েছিলাম। আরেক সাহাবী গনিমতের সম্পদ থেকে একটি ছুঁচ উঠিয়ে নিজ স্ত্রীকে দিয়েছিলেন; তিনি এই ঘোষণা শুনে দ্রুত নিজ স্ত্রীর কাছে যান এবং সেই ছুঁচ ফেরত নিয়ে এসে গনিমতের সম্পদে রেখে দেন। মহানবী(সা.) গনিমতের সম্পদ বণ্টন করার সূচনা মনস্তুষ্টি করার মাধ্যমে করেন। তিনি (সা.) সর্বপ্রথম আরবের বিখ্যাত মানুষজনের মাঝে বণ্টন করেন। যারা নিজেদের গোত্রে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিল, তাদেরকে তিনি (সা.) তাদের মনস্তুষ্টির জন্য উপহার প্রদান করেন। তিনি (সা.) তাদের মাঝে কাউকে একশ উট দিয়েছেন, কাউকে পঞ্চাশ উট দিয়েছেন, এছাড়া রূপা ও দাস তো রয়েছেই।

একটি সীরাত গ্রন্থে লিখিত আছে, আবু সুফিয়ান বিন হারবকে তিনি (সা.) একশ উট দিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ান যখন মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত হন তখন তাঁর (সা.) সামনে রূপার স্তুপ দেখতে পান। তখন তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি তো কুরাইশের মাঝে সবচেয়ে সম্পদশালী হয়ে গেছেন। মহানবী (সা.) হেসে ফেলেন এবং আবু সুফিয়ানকে চল্লিশ উকিয়া রূপা এবং একশ উট দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। তখন আবু সুফিয়ান বলেন, আমার ছেলে ইয়াযিদকেও দিন। তিনি (সা.) তার জন্যও চল্লিশ উকিয়া রূপা এবং একশ উট দেওয়ার আদেশ দেন। এই ইয়াযিদ ছিল আবু সুফিয়ানের ছেলে। সাধারণত যে ইয়াযিদের উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়, যার কুখ্যাতি রয়েছে- সে আবু সুফিয়ানের পৌত্র এবং হযরত মুয়াবিয়ার ছেলে ছিল। আবু সুফিয়ান বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার অন্য ছেলে মুয়াবিয়াকেও কিছু দিন। তিনি (সা.) তার জন্যও চল্লিশ উকিয়া রূপা এবং একশ উট দেওয়ার আদেশ দেন। এর প্রতিক্রিয়ায় আবু সুফিয়ান বলেন, আমার মা-বাবা আপনার জন্য উৎসর্গিত! আপনি দয়ালু। আমি আপনার সাথে যুদ্ধ করেছি আর আপনি একজন উত্তম যোদ্ধা। এরপর আমি আপনার সাথে সন্ধি করেছি আর আপনি সর্বোত্তম শান্তি স্থাপনকারী। আল্লাহ্ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৬) (শারাহ যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮-১৯)

মক্কার সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মাঝে হাকীম বিন হিযামও ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আর মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছিলেন, যে ব্যক্তি হাকীম বিন হিযামের ঘরে প্রবেশ করবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। ইনি হযরত খাদিজার ভাতিজা ছিলেন। তাকেও মহানবী (সা.) একশ উট প্রদান করেছিলেন। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন, আমি আরো একশ চাইলে মহানবী (সা.) তা-ও আমাকে দিয়ে দেন। আমি আরো একশ উট চাইলে তিনি (সা.) আমাকে আরো একশ উট দান করেন। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে হাকীম! এই সম্পদ উত্তম এবং সুমিষ্ট; উত্তম সম্পদ। কেউ এগুলো বিনা লোভে গ্রহণ করলে এতে সমৃদ্ধি থাকবে, আর কেউ এগুলো লোভের বশবর্তী হলে নিলে পরে এতে সমৃদ্ধি হবে না। সে ঐ ব্যক্তির ন্যায়- যে খাবার খায় ঠিকই, কিন্তু তৃপ্তি পায় না। ওপরের হাত অর্থাৎ দানকারী হাত নীচের হাত অর্থাৎ গ্রহণকারী হাত থেকে উত্তম হয়ে থাকে।

তার ওপর মহানবী (সা.)-এর উপদেশের এমন প্রভাব হয় যে, সে সময়ই তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! সেই সত্তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ আবির্ভূত করেছেন! আজকের পর মৃত্যু অবধি আমি কারো কাছে কিছু চাইব না।কিছু বর্ণনানুযায়ী সেই দু -শো উট যা তিনি চেয়েছিলেন, তা-ও ফিরিয়ে দেন এবং আজীবন নিজের এই অঙ্গীকারে অটল থাকেন, কারো কাছে কিছু চান নি। এর ওপর এতটাই অটল ছিলেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিজ খিলাফতের যুগে যখন কোনো অর্থ তাকে দিতেন, তিনি সেটি গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। এরপর হযরত উমর (রা.) নিজের খিলাফতকালে অর্থ প্রদানের জন্য তাকে ডাকেন। ইসলামের বিজয়সমূহের ফলে বিপুল অর্থসম্পদ আসত, খলীফাগণ সাহাবীদেরকে উপহারস্বরূপ সেসব থেকে দিতেন। কিন্তু হযরত হাকীম বিন হিযাম (রা) গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) , ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩০৩-৩০৪] (আসাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩০৩-৩০৪)

এতে হযরত উমর (রা.) উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে লোকসকল! সাক্ষী থাকো। আমি তাকে তার অধিকার দিয়েছি, কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। তাঁর (সা.) বদান্যতা ও দানশীলতা দ্বারা কল্যাণমণ্ডিত ব্যক্তিদের মাঝে একজন ছিলেন মক্কার নেতা সাফওয়ান বিন উমাইয়া। ইনি সেই সাফওয়ান, যার কাছ থেকে হুনাইনের যুদ্ধের সময়ে মহানবী (সা.) বর্ম ও অস্ত্র ধার নিয়েছিলেন। তিনি মুশরিক অবস্থাতেই হুনাইনের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩১৬) [দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.),৯ম খণ্ড, পৃ: ২৩৬)

কিছু রেওয়ায়েত অনুসারে সাফওয়ান মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছিল, হায়! আমরা যদি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করার সুযোগ পেতাম অথবা বিরোধী তথা শত্রুপক্ষ মুহাম্মদ (সা.)-কে পরাজিত করত!

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩২১)

কিন্তু এই যুদ্ধেই তার হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তন হওয়া আরম্ভ হয় এবং যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় আসে, তখন তিনি (সা.) তাকে একশ উট দান করেন। বরং সহীহ মুসলিমের রেওয়ায়েত অনুসারে তিনশ উট দান করেন। আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে, সেই দিনগুলোতেই মহানবী (সা.) একটি উপত্যকা অতিক্রম করেন যেখানে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের উট ও ছাগল ছিল, আর সেই উপত্যকাটি সেসব উট ও ছাগলে পূর্ণ ছিল। সাফওয়ান এত সম্পদ দেখে বিস্মিত হয়ে দেখতে থাকে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু ওয়াহাব! [এটি সাফওয়ানের ডাকনাম ছিল।] এই উপত্যকা কি তোমাকে বিস্মিত করেছে? সে বলে, জি হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, এই সমস্ত সম্পদ তোমার, তুমি নিয়ে নাও। সাফওয়ান নির্দ্বিধায় বলে ওঠে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্র নবী। কেননা নবী ছাড়া আর কেউ এভাবে দান করতে পারে না। অপর একটি রেওয়ায়েত অনুসারে সাফওয়ান বিন উমাইয়া স্বয়ং বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) ক্রমাগত আমাকে হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দিতে থাকেন, যার ফলাফল দাঁড়ায়- তিনি (সা.) ইতোপূর্বে সমগ্র সৃষ্টির মাঝে আমার সবচেয়ে অপছন্দের ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু এরপর তিনি (সা.) সমগ্র সৃষ্টিকুলের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়ে গেলেন। মোটকথা তিনি (সা.) আরবের বিভিন্ন সর্দারকে দান করতে থাকেন, যাদের মোট সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক বর্ণনা করা হয়েছে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৬) (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস-২৩১৩) (শারাহ যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১)

এরপর মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.)-কে অন্য লোকদের ডাকার নির্দেশ দেন এবং তাদের মাঝে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করেন। প্রত্যেকের ভাগে চারটি উট অথবা চল্লি শটি ছাগল পড়ে। আর এভাবে সেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ- যা তখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি সম্পদ ছিল, তা পুরোটাই তিনি লোকদের মাঝে বণ্টন করে দেন।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) , ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৮৯] (শারাহ যুরকানি, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আল্লাহ্র রসূল (সা.) বলেছেন, "তোমরা খেজুরের একটি টুকরা (আল্লাহ্র রাস্তায়) দান করে হলেও আগুন হতে বাঁচ।" (বুখারী, কিতাবুয্ যাকাত)।

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (S)

মহানবী (সা.)-এর জীবনীর এই দিকটি মনোযোগের দাবি রাখে। বিরোধীরা তাঁর (সা.) ও তাঁর (সা.) যুদ্ধাভিযানসমূহের ওপর এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, মুসলমানরা যেহেতু দরিদ্র ও কপর্দকশূন্য ছিল, সেজন্য তারা যুদ্ধ আরম্ভ করেছিল। যদি এই বিষয়ের সামান্যও সত্যতা থাকত, তাহলে হুনাইনের যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভিন্নভাবে বণ্টন করা হতো। কিন্তু এখানে আমরা দেখি, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একটি বড়ো অংশ অন্যদের মনস্তুষ্টির জন্য দান করা হয়েছে।

[সূত্র: সীরাতুন নবী (সা.), প্রণেতা- শিবলী নুমানী, ১ম ভাগ, পৃ: ৩৯৬]

কুরাইশ নেতাদের দেওয়া হয়েছে। বরং কতিপয় রেওয়ায়েত অনুসারে সমস্ত সম্পদ অন্যদের মাঝে বণ্টন করা হয়। এতে প্রজ্ঞা যা-ই থাকুক না কেন, জগৎ দেখেছে- তিনি (সা.) নিজের জন্য কিছু রাখেন নি। বরং কিছু রেওয়ায়েত অনুসারে, যার বিস্তারিত ভবিষ্যতে বর্ণনা করা হবে, তিনি (সা.) নিজের নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত সাহাবীদের,অর্থাৎ মদীনার আনসারকে এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে কিছুই দেন নি। মহানবী (সা.) কুরাইশকে মালে গনিমত প্রদানের প্রজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, إِنِّيْ أُعْطِيْ قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ لِأَنَّهُمْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ অর্থাৎ আমি কুরাইশকে প্রদান করে তাদের মনোস্তুষ্টির ব্যবস্থা করছি। কেননা কুফরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের তাদের এখনো বেশি দিন হয় নি, অর্থাৎ তাদের ঈমান এখনো এতো দৃঢ় হয় নি। (সহীহ বুখারী, কিতাব ফারজুল খুমস, হাদীস-৩১৪৬) বুখারীর অপর এক বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) বলেছেন,

إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ ।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৩৩৪)

অর্থাৎ কুরাইশের কুফর এবং ধ্বংস ও বিপর্যয়ের দুঃসময়টা সদ্যই অতিক্রান্ত হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য হলো তাদের ক্ষতিপূরণ ও তাদের মনোস্তুষ্টি করা। আর এরপর এই প্রজ্ঞাপূর্ণ বণ্টন ও দানের এরূপ কল্যাণময় প্রভাব প্রকাশ পেয়েছে যে, সেসব লোক যারা তাঁর (সা.) রক্তপিপাসু ছিল, এখন তাদের নিকট মহানবী (সা.)-ই পৃথিবীতে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে যান। যারা এক সময় ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল, তারাই এখন ইসলাম ও মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করার জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়; আর তাদের মধ্যে কতক এমন ছিল যারা পরবর্তীতে ইসলামী যুদ্ধে শাহাদাত বরণের মর্যাদা লাভ করেছেন এবং তাদের সকলের ইসলাম সর্বোত্তম ইসলাম সাব্যস্ত হয়েছে।

[দায়েরায়ে মারেফ, সীরাত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) , ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৯৮-২৯৯]

সে সময় কিছু মুনাফিক শ্রেণির লোক গনিমতের সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে আপত্তি উত্থাপন করে এবং শিষ্টাচার বহির্ভূত ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণও করে। আর মহানবী (সা.)-এর প্রতি এই অপবাদও আরোপ করে যে, নাউযুবিল্লাহ্, তিনি (সা.) ন্যায়বিচার করেন নি কিংবা আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছানুযায়ীও কাজ করেন নি। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন এটি শুনতে পান তখন তাঁর পবিত্র চেহারা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে এবং তিনি বলেন, যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) ন্যায়সঙ্গত আচরণ না করে থাকে, তাহলে কে আছে যে ন্যায়বিচার করবে?

এরপর তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ আমার ভাই মূসার প্রতি দয়া করুন, তাকে এর চাইতেও বড়ো বড়ো দুঃখকষ্ট প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। এমনিভাবে যুল খুওয়াইসিরা নামক আরেক ব্যক্তি তাঁর (সা.) পাশে দাঁড়িয়ে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আজকে আপনি যা করেছেন আমি তা দেখেছি। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, আচ্ছা! কী দেখেছো? সে বলে, আপনি ন্যায়বিচার করেন নি। তিনি (সা.) বলেন, তোমার সর্বনাশ হোক! যদি আমি ন্যায়বিচার না করি তাহলে আর কে করবে? এ কথা শুনে হযরত উমর (রা.) ও হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) দাঁড়িয়ে যান এবং নিবেদন করেন, তাকে হত্যা করার অনুমতি দান করা হোক। তিনি (সা.) বলেন, না; হতে পারে, এই ব্যক্তি নামায পড়ে থাকে। [দেখুন, এটিও কোনো নিশ্চিত বিষয় ছিল না; কিন্তু শুধুমাত্র এই ধারণার কারণে যে, হতে পারে সে নামায পড়ে থাকে; তাই আমি কীভাবে বলতে পারি- তাকে হত্যা করো? বর্তমান যুগের মুসলমানদের কর্মকাণ্ড দেখুন- তারা কী করে!] তখন হযরত খালিদ নিবেদন করেন, কোনো নামাযী কি একথা বলতে পারে যা তার হৃদয়ে নেই? মহানবী (সা.) বলেন, খালিদ! আমাকে এই অনুমতি দেওয়া হয় নি যে, আমি লোকদের হৃদয় বা বুক চিরে দেখব।

তিনি (সা.) এও বলেন, এই ব্যক্তি এবং তার সাথিরা কুরআন পড়বে ঠিকই, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠনালীর নীচে নামবে না। তাদের ঈমান হলো ঠুনকো ঈমান এবং তারা ধর্ম থেকে সেভাবেই বেরিয়ে যাবে যেভাবে তির শিকারের শরীর পেরিয়ে এমনভাবে বেরিয়ে যায় যে, তিরে রক্তের বিন্দুমাত্র চিহ্নও থাকে না। তুমি তার নামায ও রোযার বিপরীতে নিজ নামায ও রোযাকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে; অর্থাৎ সে বাহ্যত অনেক দীর্ঘ ও নিয়মিত নামায আদায়কারী হবে এবং রোযা রাখার ক্ষেত্রেও কঠোর হবে।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪০৪-৪০৫) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৭৩-১৭৪)

[অনেক মুসলমানের আমল এমনটিই, আর বিশেষভাবে বর্তমানে আমরা আলেম নামধারীদের আমল এরূপই দেখতে পাই। তিনি (সা.) পূর্বেই এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।] তফসীরকারকগণ বর্ণনা করে থাকেন, এই ব্যক্তিই খারেজী নৈরাজ্যের মূল হোতা সাব্যস্ত হয় এবং হযরত আলী (রা.)-র সময়ে এই দলের আত্মপ্রকাশ ঘটে। হযরত আলী (রা.) এই দলের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন এবং মহানবী (সা.) তাদের সম্পর্কে যেরূপ বলেছিলেন- তারা হুবহু সেরকমই করেছে। (সূত্র: উমদাতুল ক্বারী, ১৫ খণ্ড, পৃ: ৩৪৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, যুল খুওয়াইসিরা নামক এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আজ আপনি যা করলেন, তা আমি দেখলাম। তিনি (সা.) বলেন, তুমি কী দেখেছ? সে বলে, আমি লক্ষ্য করেছি, আপনি আজ অন্যায় করেছেন, ন্যায়বিচার করেন নি; নাউযুবিল্লাহ্। তিনি (সা.) বলেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ! আমি যদি ন্যায়বিচার না করি তাহলে আর কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে ন্যায়বিচার করবে? তখন সাহাবীরা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে যান; আর যখন এই ব্যক্তি মসজিদ থেকে উঠে চলে যায়, তখনতাদের (রা.) মাঝে কয়েকজন বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এ ব্যক্তি ওয়াজিবুল কতল (অবশ্য হত্যাযোগ্য)। আপনি কি আমাদেরকে তাকে হত্যা করার অনুমতি দেবেন? [এ যুগে মানুষজন রসূল অবমাননা সম্পর্কে বড়ো বড়ো আস্ফালন করে। অথচ এখানে লক্ষ্য করুন!]

মহানবী (সা) বলেন, এ ব্যক্তি যদি আইন মান্য করে তাহলে আমরা তাকে কীভাবে হত্যা করতে পারি? অর্থাৎ আমাদের যে আইনকানুন রয়েছে তা যদি সে মান্য করে, তাহলে ঠিক আছে; হত্যা করার কোনো প্রয়োজন নেই।

" সাহাবীরা (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল(সা.)! এক ব্যক্তি যদি বাইরে এক রকম প্রকাশ করে, অথচ তার হৃদয়ের চিত্র আরেক রকম হয়-এমন ব্যক্তি কি তবে শাস্তিযোগ্য নয়? মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা এমন আদেশ দেন নি যে, আমি মানুষের অন্তরের ধারণা অনুযায়ী তাদের সাথে ব্যবহার করব। বরং আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন মানুষের সাথে তাদের বাহ্যিক অবস্থা অনুযায়ী ব্যবহার করি।

অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, এই ব্যক্তি এবং তার সঙ্গীরা একদিন ইসলাম ধর্মে বিদ্রোহ করবে। "

তবে হ্যাঁ, আমি একথা বলে দিচ্ছি, এখন তো কোনো সাজা দিচ্ছি না; তবে বিদ্রোহ করলে সে-ও সাজা ভোগ করবে।"

অতঃপর হযরত আলী (রা.)-র যুগে এ ব্যক্তি ও তার গোত্রের লোকজন সেসব বিদ্রোহীর নাটের গুরু ছিল যারা হযরত আলী (রা.)-র সাথে বিদ্রোহ করেছিল এবং খারেজী নামে আজ অবধি প্রসিদ্ধ।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৩৫৮)

অবশিষ্টাংশ পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে,ইনশাআল্লাহ্।

(আল ফজল ইন্টার ন্যাশনাল, ১০ই অক্টোবর, ২০২৫)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমরা সর্বাবস্থায় সহজ পদ্ধতি সৃষ্টি কর, জটিলতার সৃষ্টি করো না। তোমরা সুসংবাদ দান কর, কিন্তু ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করো না।"

(মুসিলম, কিতাবুল জিহাদ)।

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar Mandal
From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

অঙ্গ সংগঠনগুলির বাৎসরিক ইজতেমা(২০২৫)

আগামী ২৪,২৫ ও ২৬ শে অক্টোবর, ২০২৫ সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর অনুমোদন ক্রমে এবছর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত, মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্ ভারত-এর বাৎসরিক ইজতেমা কাদিয়ান দারুল আমান-এর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জামাতের সদস্যদের সেই অনুসারে দোয়ার মাধ্যমে এই সকল ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। (সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত রসূল করীম (সা.)বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য হজ করে এবং অশ্লীল কথা না বলে এবং কোন ঝগড়া-বিবাদ না-করে, তাহলে সে ঐ দিনের মত প্রত্যাবর্তন করবে, যেদিন তাকে তার মাতা প্রসব করেছিলেন (অর্থাৎ, নিষ্পাপ হয়ে যাওয়া অবস্থায়)।" (মুসলিম, কিতাবুল মানাসিক)।

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

যে কোন ধর্মের সত্যতা যাচাই করার সর্বোত্তম উপায় হল– তার প্রকৃত অনুসারীদের জীবন ও চরিত্র পর্যবেক্ষণ করা; যারা সেই ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তব জীবনে ধারণ করে। বর্তমান যুগে আহমদীয়া মুসলিম জামাতই একমাত্র সম্প্রদায়, যারা দাবি করে যে তারা ইসলামের প্রকৃত, শান্তিপ্রিয় ও মানবকল্যাণমূলক বার্তাকে ধারণ ও প্রচার করে চলেছে।

ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা যেমন, তেমনি সেই মুসলমানরাও, যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করে না, উভয়েই ইসলামের সুনাম হানি করেছে।

জিহাদ কখনও আগ্রাসন, দখল বা আধিপত্য বিস্তারের উপায় নায়। বরং এটি হচ্ছে আত্মরক্ষার একটি সীমিত ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা,যা মানবতার শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত।"

আমাদের ধর্ম আমাদের শেখায় যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন 'রাব্বুল আলামীন'–সকল বিশ্বের পালনকর্তা। তিনি কেবল মুসলমানদেরই প্রভু নন; বরং তিনি খ্রিষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ, এমনকি নাস্তিকদেরও পালনকর্তা।

অতএব, যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপাসনা করে, তার হৃদয়ে কারো প্রতি ঘৃণার স্থান থাকতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের শিক্ষা দেয়, সকল জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির হাত প্রসারিত করতে।

পৃথিবী যেন সময় থাকতে এই বাস্তবতা অনুভব করে এবং আত্মবিনাশের পথে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকে। মানবজাতি যেন পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ন্যায়ের মাধ্যমে নতুন এক শান্তিময় যুগের দ্বার উন্মোচন করে।

আল্লাহ্ তা'লা যেন আপনাদের সকলের উপর তাঁর আশিস বর্ষণ করেন, এবং আমাদের সবাইকে সত্য, ন্যায় ও শান্তির পথে পরিচালিত করেন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) জার্মানী সফর (২০১৩)-এর প্রতিবেদন

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

'সন্ত্রাসবাদের যুগে আহমদীদের শান্তির লক্ষ্য' শিরোনামে পত্রিকাটি লিখেছে:

বস্টন ম্যারাথন বোমা বোমা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে, এক কোটিরও বেশি আহমদীর বিশ্বব্যাপী নেতা দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় শান্তি, মানবসেবা ও জনকল্যাণের তাঁর বার্তা নিয়ে এসেছেন। যদিও বিশ্বের বহু মুসলমান এমন নীতিতে বিশ্বাস করেন, আহমদীরা এই নীতিগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব ও স্বাতন্ত্র্যসহ ধারণ করেন।

ক্যালিফোর্নিয়া সফরকালে আহমদী মুসলিম জামাতের খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ ধর্ম ও রাজনীতির মিশ্রনের বিরুদ্ধে নিজের দ্বিমত ব্যক্ত করেন এবং আরব বসন্তের পর আরব দেশগুলোতে ধর্মভিত্তিক শাসনের কারণে সৃষ্ট অস্থিরতাকে ধর্মীয় শাসনের বিপদের একটি সতর্কতামূলক উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। একই সঙ্গে, তিনি পাশ্চাত্য গণতন্ত্র সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন।

সংবাদপত্রটি জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলে খলীফার এই সফরটি ১৫ই এপ্রিল ২০১৩ সালের বোস্টন হামলার আগেই পরিকল্পিত ছিল। ঐ হামলাগুলো আবারও আমেরিকান জনগণের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি সৃষ্টি করেছিল– সেই হামলাকারীর কট্টর ইসলামীপন্থী ছিল কি না, তা নির্বিশেষে। তবে এই বিশ্ব ধর্মীয় নেতা মনে করেন, এখন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ও বিদ্বেষ দূর করা প্রয়োজন।

অন্যান্য শান্তিপ্রিয় মুসলমানদের মতো আহমদীয়া জামাতও সহিংসতাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তার বিরুদ্ধে সরব হয়। ভারতের কাদিয়ান শহরে প্রতিষ্ঠিত এই জামাতটি ১৯১৪ সালে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল– একটি দল খলীফার অনুসারী, আরেকটি অপেক্ষাকৃত ছোট দল, যা কিছু ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করে।

সংবাদপত্রটি আরও উল্লেখ করে যে, ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের পর অধিকাংশ আহমদী সদ্য জন্ম নেওয়া পাকিস্তানে হিরত করেন। সেখানে আহমদীদের আইনত নিজেদের মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেওয়া নিষিদ্ধ। বর্তমানে ষাটোর্দ্ধ খলীফার অনুসারীরা বহুবার সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়েছেন, যার মধ্যে ২০১০ সালের মে মাসে লাহোরে জুমআর নামাযের সময় সংঘটিত হামলায় ৮৬জন আহমদী শহীদ হন।

যখন খলীফাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কিছু মুসলমানের সহিংস কর্মকাণ্ডের কারণে ইসলাম যে নেতিবাচক ভাবমূর্তির শিকার হয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে তিনি কীভাবে ইসলামের শান্তির বার্তা প্রচার করতে পারেন, তখন তিনি বলেন:

"ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানরা কখনো যুদ্ধ শুরু করে নি। তাদের উপর নিপীড়ন চালনো হয়েছিল, এবং তারা কেবল আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই যুদ্ধগুলো কেবল তখনই সংঘটিত হয়েছিল যখন মুসলমানদের তলোয়ার ধরতে বাধ্য করা হয়েছিল। আজ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন ধর্মীয় যুদ্ধ নেই। যে কোনো দল যদি ধর্মের নামে যুদ্ধ প্রচার করে, আমাদের মতে তারা ভুল পথে রয়েছে।"

তিনি আরও বলেন, ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা যেমন, তেমনি সেই মুসলমানরাও, যারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা অনুসরণ করে না, উভয়েই ইসলামের সুনাম হানি করেছে। তিনি বলেন, ইসলামী শিক্ষার অপব্যাখ্যা ছড়িয়েছে সেই সব মুসলমানদের কারণে যারা এর সত্যিকারের নীতি অনুসরণ করে না। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমরা 'Muslims For Life' নামে কর্মসূচি শুরু করেছি এবং প্রথমবারের মতো হাসপাতালগুলোকে দশ হাজার ইউনিট রক্তদান করেছি।"

যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, তিনি কি ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণের পক্ষপাতী এবং আরব দেশের ইসলামপন্থী আন্দোলনগুলো কি ধর্মীয় সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বন্ধ করলে ইসলামের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে না, তখন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ উত্তর দেন:

"মিশরে আমরা দেখেছি যে হোসনি মোবারকের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কোন কার্যকর ফল হয় নি। মানুষ তাঁর দায়িত্ব পালনের ব্যর্থতার কারণে তাঁর বিরোধিতা করেছিল, কিন্তু বিপ্লবের ফল কী হল? একই অবস্থা লিবিয়াতেও–এখন সেখানে কোন কার্যকর সরকার নেই; প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব শাসন–ব্যবস্থা রয়েছে। লিবিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে সতর্ক করেছেন যে, যদি পরিস্থিতি এমনই চলতে থাকে তবে ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে। সুতরাং যদি সত্যিই গণতন্ত্র কাম্য হয়, তবে এই অনিশ্চয়তা দূর করতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

যখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কীভাবে আরব অঞ্চলে– যেখানে যুদ্ধ ও বিদ্রোহ অব্যাহত– শান্তি আনতে পারে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, খলীফা বলেন–

"সম্প্রতি ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট এই দেশগুলোতে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েনের প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে শান্তিরক্ষা বাহিনীতে আরব সৈন্যদেরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া জরুরী, পশ্চিমা সৈন্যদের নয়। ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রতিবেশী দেশগুলোর দায়িত্ব হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা করা,

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হয় তখন তাদেরকে নামাযের জন্য আদেশ দান কর। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হয় তখন তাদের এই ব্যাপারে শাসন কর এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (আবু দাউদ)।

দোয়াপ্রার্থী: Sadique Mahdi Hasan, Bithari, 24 PGS (N)

অন্যায় প্রতিরোধ করা এবং অত্যাচারীদের নিয়ন্ত্রণ করা। অতএব, সিরিয়াতেও শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রতিবেশী দেশগুলোর।"

সিরিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ করার উপায় সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন:

"মানুষ এখন স্বীকার করতে শুরু করেছে যে, যদিও প্রাথমিক বিদ্রোহটি সুন্নী ও আলাউইদের মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছিল– কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সুন্নীদের সরকারে খুব কম প্রতিনিধিত্ব ছিল– তবে পরবর্তীকালে বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। এটি আর কেবল সুন্নিদের বঞ্চনার প্রশ্ন নয়; এটি এখন পশ্চিমা শক্তিগুলোর স্বার্থের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে, এবং উগ্রপন্থী উপাদানগুলোও এতে সম্পৃক্ত হয়েছে। বিদ্রোহীরাও বিভক্ত এবং বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করছে। যদিও আন্দোলনটি সরকারের অত্যাচারের কারণে শুরু হয়েছিল, এখন উভয় পক্ষই অন্যায় করছে। তাই একটি ন্যায্য ও স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করতে হবে, যাতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়।"

যখন জিজ্ঞাসা করা হয়, প্রতিবেশী দেশগুলোর শান্তি প্রতিষ্ঠায় কী দায়িত্ব রয়েছে এবং রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র যখন কুটনৈতিক প্রচেষ্টা পুনরায় শুরু করছে, তখন খলীফা বলেন:

"বিশ্ব এখন একটি গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। এখনও দুটি পরাশক্তি আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাব বিস্তার করছে– রাশিয়া, যা বর্তমানে সিরিয়ার সরকারকে সমর্থন দিচ্ছে, এবং পশ্চিমা শক্তিগুলো, যারা বিদ্রোহীদের সমর্থন করছে। উভয় পক্ষেরই স্বার্থে এই সংকটের সমাধান ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। যদি সংঘাত অব্যাহত থাকে, তবে এটি এক বৈশ্বিক যুদ্ধের রূপ নিতে পারে যা সমগ্র বিশ্বকে জড়িয়ে ফেলবে। উভয় শক্তিই এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছে যে, একটি শান্তিপূর্ণ ও পারস্পরিকভাবে গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করা আবশ্যক।"

যখন আহমদীয়া নেতৃত্বকে পাকিস্তান ত্যাগ করতে হয়েছে, সেই প্রেক্ষিতে আহমদীদের সঙ্গে অন্যান্য মুসলমানদের পার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে খলীফা ব্যাখ্যা করেন:

আমাদের বিশ্বাস, শেষ যুগে একজন আল্লাহ প্রেরিত ব্যক্তি আসবেন, যিনি ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ হবেন, এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে তিনি একজন নবী ছিলেন, তবে শরীয়তধারী নবী নন। অপরদিকে অন্যান্য মুসলমানরা মনে করেন, পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পরে কোন নবী আসতে পারে না,কারণ তিনি খাতামান নবী (নবীদের শেষ)"

তিনি আরও বলেন: "পাকিস্তানে এমন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে আহমদীরা সংবিধান ও আইনের দৃষ্টিতে মুসলমান হিসেবে গণ্য হন না। পাকিস্তানে লক্ষ লক্ষ আহমদী আছে, এবং অন্যান্য দেশেও আমাদের বিরোধিতা অব্যাহত রয়েছে। মুসলিম আলেমরা আশঙ্কা করেন যে, যদি আহমদীদের ইসলাম প্রচার ও চর্চার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে তারা অন্যান্য মুসলমানদের প্রভাবিত করে আহমদী করে তুলবে।"

যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, পৃথিবীর কোন অঞ্চলে আহমদীয়া জামাত সবচেয়ে শক্তিশালী এবং কোথায় এর দ্রুত বৃদ্ধি ঘটছে, তখন খলীফা উত্তর দেন: "পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে আহমদীদের একটি বৃহৎ ও দ্রুত বর্ধনশীল জনগোষ্ঠী রয়েছে। এশিয়াতেও আমরা মিলিয়ন সংখ্যায় আছি। একসময় পাকিস্তানেই আহমদীদের সংখ্যা সর্বাধিক ছিল, কিন্তু এখন কিছু পশ্চিম আফ্রিকান দেশে আহমাদের সংখ্যা আরও বেশি। প্রতি বছরই আমরা লক্ষ লক্ষ নতুন সদস্য লাভ করছি।"

শেষে খলীফা বলেন: "কিছু মানুষ ইসলামকে ভয় পায়; কেউ কেউ নাস্তিক, যারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে; আবার কেউ কেউ ধর্ম থেকে বিমুখ ও নিরাসক্ত হয়ে পড়েছে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা ধর্মের দিকে ফিরে আসবে।যখন তা ঘটবে, আমরা আশা করি ইসলামের প্রকৃত ও বিশুদ্ধ শিক্ষার মাধ্যমে আমরা সেই আধ্যাত্মিক শূন্যতা পূরণ করব। বর্তমান প্রজন্ম হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে না, কিন্তু আগামী প্রজন্ম অবশ্যই করবে।"

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

সর্বপ্রথমে আমি আপনাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যে, আপনারা আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন এবং আপনারা এই সভাকে মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। আমি তাঁদের প্রতিও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই, যাঁরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিষয়ে তাঁদের চিন্তা ও অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এবং প্রশংসাসূচক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তদ্রূপ, আমি কৃতজ্ঞ তাঁদের প্রতি, যাঁরা সৌজন্যবশত শুভেচ্ছাস্বরূপ আমাকে উপহার প্রদান করেছেন– বিশেষত এই শহরের প্রতীকী চাবি আমাকে প্রদানের জন্য আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

এই অনুষ্ঠানে আপনাদের অংশগ্রহণ এই ইসলামী ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রতি আপনাদের সদ্ভাব, মুক্তচিন্তা ও উদার চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, আপনারা ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধি করতে আন্তরিকভাবে আগ্রহী।

এই ভূমিকার পর আমি এমন এক বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে চাই, যা আজকের বিশ্বপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যার সঠিক উপলব্ধি ও আলোচনা সময়ের দাবী।

ইসলামকে কেন্দ্র করে ভীতি ও সংশয়ের উৎস

হুযুর আনোয়ার বলেন: "আমি আজ এমন এক বিষয়ে আলোচনা করতে চাই, যা আধুনিক পাশ্চাত্য সমাজে এবং সাধারণ অমুসলিমদের মধ্যে ইসলামের প্রতি যে ভয় ও উদ্বেগ বিদ্যমান, তার কারণ ও উৎপত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। নিঃসন্দেহে, এই ভীতির একটি অংশ সৃষ্টি হয়েছে কিছু তথা কথিত মুসলমান ও স্বঘোষিত ইসলামী সংগঠনের অন্যায় কার্যকলাপের কারণে। তথাপি, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা প্রয়োজন যে, সন্ত্রাসবাদ ও চরমপন্থার এই কর্মকাণ্ডসমূহের সঙ্গে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও দিকনির্দেশনার কোন সম্পর্ক নেই।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম শব্দের অর্থই হচ্ছে শান্তি, প্রশান্তি ও যাবতীয় অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা। সত্যই, পবিত্র কুরান ঘোষণা করেছে যে, শান্তির এই বাণীই ইতিহাসের প্রতিটি নবীর শিক্ষার মূল ভিত্তি ও সারকথা।"

ইসলামের মৌলিক শিক্ষা: আল্লাহ্‌র অধিকার ও মানবাধিকারের পরিপূর্ণতা

হুযুর আনোয়ার আরও বলেন:

"ইসলাম তার অনুসারীদের শিক্ষা দেয় যে, তারা যেন কেবল আল্লাহ্ তা'লার অধিকার (হুকুকুল্লাহ্) পূরণেই সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং মানবজাতির প্রতি তাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব (হুকুকুল ইবাদ) যথাযথভাবেব পালন করে। উভয় দায়িত্বই সমানভাবে অপরিহার্য ও একে অপরের পরিপূরক।

পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে- পূর্ববতী নবীগণের শিক্ষা ও জীবনালেখ্যের আলোকে -যে, আল্লাহ্ প্রেরিত প্রতিটি নবী তাঁর অনুসারীদের এই দুই প্রকার অধিকার প্রতিপালনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অতএব, এটি চিন্তা ও ন্যায়বোধের পরিপন্থী হবে যদি কেউ মনে করে যে, একদিকে আল্লাহ্ পূর্ববতী নবীদের প্রশংসা করেন এই কারণে যে তাঁরা মানুষকে এই দ্বৈত দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, অন্য দিকে তিনি একই সঙ্গে এমন এক নবী– মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)– যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁকে এই পৃথিবীর শান্তি বিনষ্টের আদেশ দিতে পারেন।

নিঃসন্দেহে কোন সুবিবেচক ব্যক্তি এমন পরস্পর বিরোধি ধারণা কখনও মেনে নিতে পারে না।"

ন্যায় ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের আহ্বান

হুযুর আনোয়ার বলেন:

"সত্যিকার ন্যায় পরায়ণতা এই দাবি করে যে, ইসলামকে লোকশ্রুতি, ভুল ধারণা বা পূর্বগৃহীত মতামতের ভিত্তিতে বিচার করা যাবে না। বরং, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিষয়ে মতামত প্রকাশের পূর্বে প্রত্যেক ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব হল– তিনি যেন এই ধর্মের শিক্ষা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন, চিন্তাশীল মননের পরিচয় দেন, আন্তরিক মনোভাব পোষণ করেন, এবং যৌক্তিক সততা বজায় রাখেন।

কারণ, সুসংগঠিত ও গভীর মননশীল বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞানই একমাত্র সত্য ও যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।"

প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইসলামের পুনর্জাগরণ

হুযুর আনোয়ার বলেন:

"যে কোন ধর্মের সত্যতা যাচাই করার সর্বোত্তম উপায় হল– তার প্রকৃত অনুসারীদের জীবন ও চরিত্র পর্যবেক্ষণ করা; যারা সেই ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ বাস্তব জীবনে ধারণ করে। বর্তমান যুগে আহমদীয়া মুসলিম জামাতই একমাত্র সম্প্রদায়, যারা দাবি করে যে তারা ইসলামের প্রকৃত, শান্তিপ্রিয় ও মানবকল্যাণমূলক বার্তাকে ধারণ ও প্রচার করে চলেছে।

স্বাভাবিকভাবেই কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন; যখন মুসলমানদের বৃহত্তর অংশ এবং তাঁদের অনেকে আলেম আহমদীদের মুসলমান হিসেবেও স্বীকার

হাদীস

হযরত রসূল করীম (সা.) কখনও বিধবা ও অভাবী লোকদের সাহচর্যকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখতেন না এবং তাদেরকে এড়িয়েও চলতেন না। বরং তিনি তাদের অভাব মোচন করে দিতেন। (মুসনাদ, দারমী)।

দোয়াপ্রার্থী: Late Abu Bakar Siddiq & Manjuara Mandal
From: Abu Hasan Mondol . Bithari, 24 PGS (N)

করেন না, তখন আহমদীরা কীভাবে ইসলামের সত্য ও প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের দাবি করতে পারে?"

"এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: "আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, পবিত্র কুরআন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে–ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম এবং এর সঙ্গে কোন ধরণের সন্ত্রাসবাদ বা চরমপন্থার কোন সম্পর্ক নেই।

অধিকন্তু, রসুলুল্লাহ্ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলিম সমাজ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ে নিমজ্জিত হবে; তখন ভ্রান্ত মতবাদ ও বিকৃত ব্যাখ্য ছড়িয়ে পড়বে, বিভাজন ও বিরোধ বৃদ্ধি পাবে, এবং যদিও কুরআনের অক্ষর অবিকৃত থাকবে, তার প্রকৃত তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা মানুষ হারিয়ে ফেলবে।

সেই সময় আল্লাহ্ তা'লা একজন সংস্কারককে প্রেরণ করবেন–প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হিসেবে-যিনি ইসলামের পুনর্জাগরণ সাধন করবেন, কুরআনের প্রকৃত অর্থ ও প্রজ্ঞা উদ্ভাসিত করবেন, এবং বিশ্ববাসীর সামনে সেই বিশুদ্ধ, সমুজ্জ্বল ও শান্তিপূর্ণ ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন, যা চৌদ্দশ বছর পূর্বে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে তাঁর খলীফাগণ বাস্তবায়ন করেছিলেন।

সেই প্রতিশ্রুত মসীহ মহানবী (সা.)-এর মহান আদর্শ ও পবিত্র কুরআনের প্রকৃত শিক্ষার আলোকে মানবজাতিকে ভালবাসা, সম্প্রীতি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথে পরিচালিত করবেন এবং ধর্মের নামে সংঘটিত সকল যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন।

আমরা আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদই (আ.) সেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী, যিনি রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূরণের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, তাঁকে আল্লাহ্ তা'লা প্রেরণ করেছেন বিশ্বের নিকট ইসলামের প্রকৃত, আলোকোজ্জ্বল ও শান্তির বার্তা প্রচারের জন্য।"

পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) –পবিত্র কুরআনের জীবন্ত প্রতিমূর্তি

হুযুর আনোয়ার বলেন:

"এই যৎকিঞ্চিত ভূমিকার পর আমি সংক্ষেপে ইসলামের শান্তিময় ও আকর্ষণীয় বৈশিষ্টের কয়েক দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। যে কোন দৃষ্টান্ত বর্ণনা করার পূর্বে আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই যে, মহানবী (সা.) ছিলেন পবিত্র কুরআনের এক জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তাঁর জীবন ও চরিত্র ছিল ঐশী গ্রন্থের শিক্ষা ও দিকনির্দেশনার পরিপূর্ণ প্রতিফলন। যাঁরা তাঁর জীবন ও কর্ম অধ্যয়ন করেছেন, তারা জানেন যে, তাঁর প্রতিটি আচরণ ও সিদ্ধান্ত কুরআনের নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।

সময় সীমিত হওয়ায় কুরআন করীমের সমস্ত দিক নিয়ে আলোচন করা যাবে না। বস্তুত, এত স্বল্প সময়ে কুরআন করীমের কোনো একটি দিক নিয়েও পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়। তথাপি আমি সংক্ষেপে ইসলামী শিক্ষামালার একটি বিশেষ দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করব। দুঃখের বিষয় হল, আধুনিক যুগে এসে আজ কুরআন করীমের এই দিকটি নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, ফলে মুসলিম বিশ্বকে এক আতঙ্ক গ্রাস করেছে। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআন করীম ও রসুল করীম (সা.)-এর শিক্ষার কী ভূমিকা রয়েছে- তা নিয়েই আজকের আমার এই আলোচনা।

মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তিনি সর্বদা দয়া, করুণা, ন্যায় ও মানবপ্রেমের শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর জীবন প্রমাণ করেছে যে, ইসলাম কোনভাবেই সহিংসতা বা নিপীড়নের ধর্ম নয়; বরং এটি এমন এক দিকনির্দেশনা, যা মানুষকে শান্তি, ন্যায় ও সহাবস্থানের পথে পরিচালিত করে।

প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের আদর্শ আচরণ

হুযুর আনোয়ার বলেন:

"পবিত্র নবী (সা.)-এর সাহাবাগণ তাঁর শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিশ্বে এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। তারা ছিলেন এমন এক সমাজের নির্মাতা, যেখানে বিভিন্ন বর্ণ, জাতি ও গোত্রের মানষ পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব ও সম্মান প্রদর্শন করত।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মুসলমানরা যখন বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে গিয়েছিল, তারা কখনও তালোয়ার দ্বারা মানুষকে ধর্মান্তরিত করে নি; বরং তাদের ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাবের কারণে অসংখ্য মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামের শান্তির বার্তা গ্রহণ করেছিল।"

ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ ও ভুল ধারণার উৎপত্তি

হুযুর আনোয়ার বলেন: "আজ ইসলামের প্রতি যে ভয়, সংশয় ও শত্রুতা দেখা যায়, তার মূল কারণ হল– ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে মুসলমানদের বিচ্যুতি এবং কিছুটা চরমপন্থী ও হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড, যা ইসলামের নামে সংঘটিত হলেও আসলে ধর্মের মূল নীতির পরিপন্থী।

অথচ সত্য এই যে, পবিত্র নবী (সা.)-এর শিক্ষা কখনও কোন ব্যক্তি বা জাতির বিরুদ্ধে ঘৃণা বা বৈরিতার অনুমোদন দেয় না। বরং; তিনি শিখিয়েছেন- যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর শান্তি নষ্ট করে, সে প্রকৃত মুসলমান নয়।"

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের ইসলামী ধারণা

"মহানবী (সা.) যে সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটি ছিল পরিপূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের ভিত্তিতে নির্মিত।

মদিনায় যখন তিনি ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি ইহুদি, খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, যা ইতিহাসে 'মীসাক-এ-মদীনা' নামে প্রসিদ্ধ। এই ঐতিহাসিক দলিলের মাধ্যমে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার ধর্মীয় বিশ্বাসে স্বাধীন থাকবে এবং রাষ্ট্রের সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান হবে।

এটি ছিল মানবাধিকারের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব উদাহরণ, যা আজও সভ্য বিশ্বের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ।"

ইসলামের শান্তির দর্শন

শান্তির ধর্ম- এবং এই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এটি কেবল উপদেশই দেয় না, বরং এর অনুসারীদেরকে তাদের আত্মসংযম, প্রার্থনা, এবং সামাজিক সেবার মাধ্যমে বাস্তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়।

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, প্রকৃত মুমিন সেই ব্যক্তি, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে। সুতরাং, যারা নিরীহ মানুষ হত্যা করে বা সমাজে সন্ত্রাস ও বিভীষিকা সৃষ্টি করে, তারা কেবল মানবতার শত্রুই নয়, বরং ইসলামের মৌলিক শিক্ষার বিরুদ্ধাচারী।"

জিহাদের ধারণা ও এর ভুল ব্যাখ্যা

"সাম্প্রতিককালে 'জিহাদ' শব্দটি নিয়ে যে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে, তা মূলত অজ্ঞতা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃত ব্যাখ্যার ফল। প্রকৃতপক্ষে 'জিহাদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল 'সংগ্রাম' বা 'প্রচেষ্টা'। ইসলামী পরিভাষায় জিহাদ বলতে বোঝানো হয়- অসৎ প্রবৃত্তি, অন্যায় ও অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম; ন্যায়, সততা ও সৎকর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ।

মহানবী (সা.) স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ জিহাদ হল 'নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম'– অর্থাৎ, নিজের প্রবৃত্তি, কামনা ও বাসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। তিনি এটি 'জিহাদ-এ-আকবর' বা 'মহানতম জিহাদ' নামে আখ্যায়িত করেছেন।"

সশস্ত্র জিহাদ: সীমিত ও প্রতিরক্ষামূলক প্রয়োগ

হুযুর আনোয়ার বলেন: "শুধুমাত্র প্রতিরক্ষামূলক পরিস্থিতিতে যুদ্ধ বা সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে- যখন মুসলমানদের অস্তিত্ব, ধর্মীয় স্বাধীনতা বা জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে।

কুরআন করীম স্পষ্ট ঘোষণা করছে- "যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, তারা নিপীড়িত হয়েছে বলেই লড়াই করার অনুমতি পেয়েছে; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। (সূরা আল-হজ্জ: ৪০)

এই আয়াতে প্রতীয়মান যে, যুদ্ধের অনুমতি তখনই প্রদান করা হয়েছে যখন নিরীহ মানুষদের উপর অন্যায় আক্রমণ চালানো হয়েছিল এবং তাদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল।

অতএব, জিহাদ কখনও আগ্রাসন, দখল বা আধিপত্য বিস্তারের উপায় নায়। বরং এটি হচ্ছে আত্মরক্ষার একটি সীমিত ও ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থা,যা মানবতার শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত।"

মহানবী (সা.)-এর জীবনে জিহাদের নীতি

মহানবী (সা.) তাঁর জীবনের প্রতিটি যুদ্ধে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'যেন কোন নারী, শিশু, বৃদ্ধ বা নিরস্ত্র ব্যক্তিকে আঘাত না করা হয়; যেন

মহানবী (সা.)-এর বাণী

হযরত রসূল করীম (সা.) বলেছেন, "ঐ ব্যক্তি যে কুরআনের কোন অংশ শিখেনি, নিশ্চয় তার উপমা এক পরিত্যক্ত গৃহের মত।"

(তিরমিযী, ফাযায়েলুল কুরআন)।

দোয়াপ্রার্থী: Mirza Naeema Begum & Family
Bithari, 24 PGS (N)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

"মহান বরকতময় আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'আমি আমার বান্দার সাথে ঐ ব্যবহার করে থাকি যা সে আমার সম্বন্ধে ধারণা করে। অতএব সে আমার সম্বন্ধে যেরূপ ইচ্ছা ধারণা করুক।" (বুখারী, কিতাবুত তওহীদ)।

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rasheed, Basantapur, 24 PGS (S)

কোন ধর্মীয় স্থান বা উপাসনালয় ধ্বংস না করা হয়; এবং যেন যুদ্ধক্ষেত্রেও মানবিকতা ও ন্যায়বোধ অক্ষুন্ন থাকে।

এই শিক্ষা আজকের যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীর জন্য গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ আধুনিক সমাজ যুদ্ধের নামে এমনসব বর্বরতা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে,যা ইসলাম সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে।

আধুনিক যুগে জিহাদের প্রকৃত অর্থ

বর্তমান যুগে সশস্ত্র যুদ্ধের স্থান দখল করেছে কলম, জ্ঞান, নৈতিকতা ও সেবার জিহাদ। প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ঘোষণা করেছেন যে, আজকের জিহাদ হল বুদ্ধিভিত্তিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংগ্রাম- যার মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যুক্তি, ন্যায় ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। তিনি স্পষ্ট ঘোষণা করেছিলেন-

'আমি রক্তপাতের জিহাদ বাতিল করতে প্রেরিত হয়েছি। এখন কলম ও দোয়ার মাধ্যমে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সময় এসেছে।"

ভালবাসা ও মানবসেবার জিহাদ

অতএব, প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল তার জীবন,সম্পদ ও প্রতিভা মানবতার সেবায় ব্যয় করা।

প্রকৃত জিহ্াদ হল- অসহায়কে সাহায্য করা, ক্ষুধার্তকে আহার যোগানো, অসুস্থের সেবা করা, অজ্ঞতাকে দূর করা এবং সামজে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে ব্রতী হওয়া। ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ নায়ক সেই ব্যক্তি, যিনি অন্যের দুঃখ দূরীকরণে সর্বাধিক অবদান রাখেন।'

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মানবসেবা ও শান্তির বার্তা

হুযুর আনোয়ার বলেন: "আমরা আহমদী মুসলমানরা বিশ্বাস করি যে ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও জীবন্ত ধর্ম, যা প্রতিটি যুগে মানবতার জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে। আমাদের জামাতের মূল উদ্দেশ্য হল- মানবতার সেবা, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা, এবং সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্মানবোধ জাগিয়ে তোলা।

আমাদের এই আহ্বান কেবল মুসলমানদের জন্য নয়; বরং এটি সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত। কারণ, ইসলামের শিক্ষা মানবতার সার্বজনীন কল্যাণে নিবদ্ধ– যে শিক্ষা মানুষকে ঘৃণা নয়, ভালবাসা; যুদ্ধ নয়, শান্তির পথে আহ্বান জানায়। "

সেবার মাধ্যমে ইসলামের বার্তা প্রচার

"বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের জামাতের সদস্যগণ শিক্ষার প্রসার, চিকিৎসা, এবং মানবসেবার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য বিশ্বের নিকট তুলে ধরছে।

আফ্রিকা, এশিয়া, ও দক্ষিণ আমেরিকার বহু দরিদ্র দেশে আহমদীয়া জামাত বিনামূল্যে হাসপাতাল, স্কুল ও পানীয়জলের প্রকল্প পরিচালনা করছে। এসব কাজ আমরা কোন পার্থিব লাভের আশায় নয়, বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, মানবতার সেবার প্রতি ভালবাসা থেকে সম্পাদন করি।"

আমাদের জামাতের মূলমন্ত্র `Love for all, hatred for none' অর্থাৎ, 'সকলের তরে ভালবাসা, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'। এই মন্ত্র কোন স্লোগান নয়; এটি ইসলামের শ্বাশ্বত দর্শনের সারকথা।

মহানবী (সা.) তাঁর জীবনাদর্শ দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, প্রকৃত মুসলমান কখনও অন্যকে ঘৃণা করতে পারে না। তাঁর দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষ ছিল সৃষ্টিকর্তারই এক অনন্য সৃষ্টরূপ।

অতএব, আমাদের কর্তব্য হল তাঁর সেই আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করা– ভালবাসা, করুণা ও ন্যায়ের মাধ্যমে মানবতার সেবা করা।"

অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি

আমাদের ধর্ম আমাদের শেখায় যে, আল্লাহ্ হচ্ছেন 'রাব্বুল আলামীন'–সকল বিশ্বের পালনকর্তা। তিনি কেবল মুসলমানদেরই প্রভু নন; বরং তিনি খ্রিষ্টান, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধ, এমনকি নাস্তিকদেরও পালনকর্তা।

অতএব, যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর উপাসনা করে, তার হৃদয়ে কারো প্রতি ঘৃণার স্থান থাকতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গিই আমাদের শিক্ষা দেয়, সকল জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির হাত প্রসারিত করতে।

মানবতার জন্য প্রার্থনা ও শান্তির অঙ্গীকার

যখন আমরা সারা বিশ্বের নানা স্থানে সংঘটিত সহিংসতা ও সন্ত্রাসের সংবাদ শুনি, তখন আমাদের হৃদয় গভীর বেদনায় ভরে যায়। বিশেষত, নিরীহ মানুষদের উপর সংঘটিত অন্যায় ও রক্তপাত আমাদের বিবেককে ব্যথিত করে।

এই কারণেই আমরা আজ এই সভা থেকে স্পষ্ট ঘোষণা দিচ্ছি– যে কোন ধরণের সন্ত্রাস, সহিংসতা বা মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড ইসলামের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ইসলাম শান্তির ধর্ম; এবং একজন প্রকৃত মুসলমান কখনও শান্তিভঙ্গকারী হতে পারে না।"

বিশ্বের প্রতি সতর্কবার্তা

"দুঃখের বিষয়, ইসলামের এই শান্তিময় শিক্ষা সত্ত্বেও আজ পৃথিবীর বহু স্থানে ইসলাম ও এর প্রতিষ্ঠাতাকে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। এই অপপ্রচার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ইসলামকে অন্যায়ভাবে সহিংসতা ও সন্ত্রাসের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে।অথচ আমি ইতিপূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি যে, কিছু উগ্রপন্থী ব্যক্তি বা সংগঠনের দুরাচার ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। তদ্রূপ, মুসলিম বিশ্বের বহু স্থানে যে স্বৈরাচার, দমননীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন চলছে- তা ইসলামী নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মহানবী (সা.) ঘোষণা করেছিলেন যে, অন্যায় ও নিপীড়ন কখনোই ঈমানের নিদর্শন নয়; বর তা ঈমানহীনতার পরিচায়ক।"

ন্যায়, সংলাপ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার আহ্বান

"অতএব, যারা সত্যিকার অর্থে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের উচিত কুসংস্কার ও পক্ষপাতদুষ্টতা পরিহার করে ন্যায়নিষ্ঠ সংলাপ ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

ইসলাম বা তার প্রতিষ্ঠাতাকে নিন্দা করে কোন কল্যাণ সাধিত হবে না। বরং আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব হল,মানবজাতির সম্মুখীন অন্যায়, শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটানো। মুসলমান হোক বা অমুসলিম- যে কেউ অন্যায় বা সহিংসতা করে, সে মানবতার শত্রু, এবং তাকে নিন্দা করতে হবে।"

সম্ভাব্য বৈশ্বিক সংঘাত ও মানবতার ভবিষ্যৎ

'আজকের বিশ্বের যে পরিস্থিতি, তা অত্যন্ত বিপজ্জনক মোড় নিচ্ছে। বিভিন্ন জাতি ও পরাশক্তির মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, প্রতিযোগিতা ও অস্ত্রভাণ্ডার বৃদ্ধি এই পৃথিবীকে নতুন এক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যদি এমন একটি বৈশ্বিক যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে,তবে তার বিভীষিকা অতীতের দুই বিশ্বযুদ্ধকেও ছাড়িয়ে যাবে। আধুনিক অস্ত্রশক্তি ও জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে কোটি কোটি নিরীহ প্রাণ বিনষ্ট হবে, এবং মানবসভ্যতা অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে।

তাই আজই সময়, বিশেষত বিশ্বনেতাদের জন্য, ন্যায়, সংযম ও সংলাপের পথে ফিরে আসার। অন্যথায় মানবতার ইতিহাস এক অন্ধকার অধ্যায়ে প্রবেশ করবে।

বিশ্বশান্তির একমাত্র পথ

"ইসলামের বিরুদ্ধে ভয় সৃষ্টি বা ঘৃণার প্রচার মানবতার কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা বা অবিচারের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। স্থায়ী শান্তির একমাত্র ভিত্তি হলো-ন্যায়বিচার, সত্যবাদিতা ও পারস্পরিক সম্মান।

যতক্ষণ পর্যন্ত জাতিগোষ্ঠী ও রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক অধিকার স্বীকার না করবে,ততক্ষণ প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

ইসলাম আমাদের শেখায়, যে ব্যক্তি বা জাতি ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ করে, সে কখনও শান্তি ভোগ করতে পারে না।

মানবতার প্রতি ইসলামের দৃষ্টি

পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ন্যায়বিচার ও সদাচার আদেশ করেন। (সূরা নহল: ৯) অর্থাৎ ইসলাম এমন এক নীতি প্রবর্তন করেছে, যা মানবসমাজে স্থায়ী শান্তি ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায়।

যদি বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ নিজেদের স্বার্থপর নীতিমালা পরিহার করে ন্যায় মানবতার ভিত্তিতে সম্পর্ক স্থাপন করত, তবে যুদ্ধ, শোষণ ও দুর্ভিক্ষ কখনও মানবতার অভিশাপ হয়ে উঠত না।

অতএব, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য হল- মানুষ যেন তার স্রষ্টাকে চিনে এবং মানবতার প্রতি ভালবাসা ও সহমর্মিতার মনোভাব বিকশিত করে।

সবশেষে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমার আন্তরিক দোয়া ও হৃদয়ের আকাঙ্খা এই যে-

পৃথিবী যেন সময় থাকতে এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে এবং আত্মবিনাশের পথ থেকে সরে আসে। মানবজাতি যেন পরস্পরের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ন্যায়ের মাধ্যমে নতুন এক শান্তিময় যুগের দ্বার উন্মোচন করে।

আল্লাহ্ তা'লা যেন আপনাদের সকলের উপর স্বীয় আশিস বর্ষণ করেন, এবং আমাদের সবাইকে সত্য, ন্যায় ও শান্তির পথে পরিচালিত করেন।

আপনাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।"

****

অতিথিদের মন্তব্য

ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশের প্রাক্তন গভর্নর গ্রে ডেভিসও হযরত খলীফাতুল মসীহ-র সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন এবং খাওয়ার সময় উপস্থিত থেকে তাঁর পাশে বসে থাকেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ অত্যন্ত সদয়ভাবে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। গভর্নর ডেভিস বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত কিভাবে কোন বাহ্যিক সহায়তা বা বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ছাড়াই একটি বৈশ্বিক টেলিভিশন চ্যানেল-এম.এটি.এ-পরিচালনা করছে। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহর নিকট এম.টি.এ-র ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কে জানতে চান, যেন তিনি নিজেও এই চ্যানেলটি দেখতে পারেন।

খাওয়ার শেষে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ মঞ্চ থেকে নেমে আসেন। অতিথিবৃন্দ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দৃশ্যটি যেন ঐ কবিতার পঙক্তির প্রতিফলন ছিল- "একই কাতারে দাঁড়ালেন মাহমুদ ও আয়াজ।" সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, সামরিক প্রতিনিধিবৃন্দ, বিভিন্ন থিঙ্ক ট্যাঙ্কের সদস্য এবং নানা পেশা ও শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ খলীফার সাক্ষাতলাভের আশায় এক সারিতে দাঁড়িয়েছিলেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ তাঁর অনুগ্রহবশত সকল অতিথিকে সাক্ষাতের সুযোগ দান করেন। প্রত্যেকে ক্রমানুসারে তাঁর নিকট এসে হাত মেলানোর সৌভাগ্য অর্জন করে, সংক্ষিপ্তভাবে কথা বলে, এবং কেউ কেউ ছবি তোলার অনুরোধ জানায়। প্রত্যেকে গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে এবং তাঁর প্রাঞ্জল ও গভীর চিন্তাশীল ভাষণের প্রভাবে অভিভূত হয়। অনেকেই হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন যে, হযরত খলফীতুল মসীহর ভাষণ তাদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং তাঁরা দৃঢ়বিশ্বাসী যে এই বাণী সমগ্র বিশ্বের অন্তরে প্রতিধ্বনিত হবে, যেমনটি আজ লস অ্যাঞ্জেলসে প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

সিটি কাউন্সিলের সদস্য ডেনিস জাইন তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন:

"আজকের অনুষ্ঠানটি ছিল সত্যিই অনন্য। হযরত খলীফাতুল মসীহ আমাদের ভালবাসা ও সম্মানের শিক্ষা দিয়েছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় ও পারস্পরিক সম্প্রীতি স্থাপন করা যায়। তাঁর শান্তি সৌহার্দ্যের বার্তা সবার জন্য অনুপ্রেরণা ছিল। সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং আমি নিশ্চিত যে এই বাণীর প্রতিধ্বনি সমগ্র পৃথিবীতে একইভাবে শোনা যাবে, যেমনটি আজ লস অ্যাঞ্জেলসে শোনা গেল। হযরতের লক্ষ্য হল বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠা। তাঁর সামনে আমি নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে করি।"

মার্কিন কংগ্রেসের সদস্য ডানা রোরাব্যারাক বলেন:

"আজ মহামান্য খলীফা যে চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন তা আমাদের মনে গভীরভাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এটি ছিল তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত, এবং আমি তাঁর বিদ্বান, প্রজ্ঞাময় ও যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছি। সমসাময়িক বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ বাস্তবতার অত্যন্ত নিকেট ছিল, আর তাঁর যুক্তিসম্মত ও প্রভাবশালী বক্তব্য আমার উপর গভীর ছাপ ফেলেছে। খলীফার বার্তা সর্বজনীন,সবার কাছে আকর্ষণীয়, শ্রবণযোগ্য এবং সকল ধর্মাবলম্বীর কাছে গ্রহণযোগ্য।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন র‍্যাচেল মোরান বলেন:

"শান্তি ও সম্প্রীতির প্রসারে নিবেদিত এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আমার জন্য এক বিরাট সম্মানের বিষয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ আধ্যাত্মিকতা ও আদর্শবাদের এক চমৎকার সংমিশ্রণ উপস্থাপন করেছেন,যা আমাদের দ্বন্দ্ব ও অশান্তিতে পূর্ণ বিশ্বকে শান্তি ও নিরাপত্তায় ভরিয়ে তোলার গভীর শিক্ষা দেয়। আজ আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শিখেছি যে, ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য প্রসারে আমাদের প্রত্যেকের যৌথ দায়িত্ব রয়েছে। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে যে, আমাদের মধ্যে এমন এক আধ্যাত্মিক ব্যক্তি উপস্থিত আছেন,যিনি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা নিয়ে এসেছেন- যা অনুসরণ করা হলে আমাদের সকল বিরোধ, সংঘাত ও ঘৃণা দূর হয়ে পৃথিবীতে শান্তির নন্দনকাননে পরিণত হতে পারে।"

মিশরীয় কনসুলেটের প্রতিনিধি মুহাম্মদ সামির হিলমি বলেন:

"আমি জীবনে বহু ভাষণ ও বক্তৃতা শুনেছি, কিন্তু বৈশ্বিক শান্তির বিষয়ে এমন একটি ভাষণ আমি কখনও শুনিনি। হযরত খলীফাতুল মসীহর বাণী সরাসরি আমার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে এবং আমি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। আমি নিশ্চিত, সকল উপস্থিত অতিথিরও এই একই অনুভূতি হয়েছে। হযরতের এই বার্তা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের নিকট পোঁছানো উচিত, এবং আমি নিজে তাঁর ভাষণসমূহ শুনব এবং অন্যদের কাছেও পোঁছে দিব।"

প্রফেসর সোফিয়া পানোয়া মন্তব্য করেন: "হযরত খলীফাতুল মসীহর ভাষণ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার প্রতি ভালবাসার যে বার্তা তিনি দিয়েছেন,তা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। আহমদী জামাত মানবতার জন্য এক উজ্জ্বল প্রদীপের মত, যার আজ সমগ্র বিশ্বের প্রয়োজন। "

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্যাতনামা মুসলিম সংগঠন 'মুসলিম পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিল'-এর ডিরেক্টর আজিজা হাসান বলেন:

"এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ আমাকে একজন মুসলিম হিসেবে পুনরায় উষ্ণতা ও অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ করেছে। শনিবারের এই অসাধারণ অনুষ্ঠানের জন্য সকলকে অভিনন্দন। আমি নতুন উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে অনুষ্ঠান ত্যাগ করেছি। হযরতের ভাষণ ছিল বাগ্মিতাপূর্ণ, প্রভাবশালী এবং সময়োপযোগী। আমি বিশেষভাবে আনন্দিত যে তিনি ইসলামের পবিত্র নবীর বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তির যথাযথ জবাব অত্যন্ত উৎকৃষ্টভাবে প্রদান করেছেন। বহু বক্তা এ বিষয়ে আলোচনা এড়িয়ে যান বা যুক্তিসঙ্গত জবাব দিতে পারেন না, কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহ যৌক্তিক, সরাসরি ও নির্ভুলভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন- তাও এমন এক সভায়, যেখানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।"

একজন অতিথি বলেন: "আমার জীবনে এত অল্প শব্দে শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে এত গভীর ও প্রভাবশালী ভাষণ কখনও শুনিনি। এটি সরাসরি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ার স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আভরুম মার্কো টার্ক মন্তব্য করেন:

"হযরতের সঙ্গে এই অনুষ্ঠান ছিল অত্যন্ত উচ্চ মানসম্পন্ন, সুচিন্তিত ও তাৎপর্যপূর্ণ। হযরত খলীফাতুল মসীহের ভাষণ সময়োপযোগী ও গভীরভাবে কার্যকর ছিল। এতে বর্তমান যুগের সকল সমস্যা ও বিভাজনের সমাধান নিহিত আছে।"

সান বার্নার্ডিনো কাউন্টির শেরিফ জিম ম্যাকমাহন বলেন:

"হযরতের ভাষণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। এমন এক বাণীই ছিল সময়ের প্রয়োজন, এবং তাঁর দিকনির্দেশনা অনুসরণ করেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।"

একটি খ্যাতনামা আইন সংস্থার পরিচালক রবার্ট ক্লুকেট মন্তব্য করেন:

'এই সমাবেশ কতটা অনন্য ছিল- অসাধারণ এক অনুষ্ঠান। ইসলামী যুদ্ধনীতি সম্পর্কে হযরতের ব্যাখ্যা ছিল অত্যন্ত প্রভাবশালী। তিনি প্রদর্শন করেছেন, কিভাবে অমুসলিমদের সঙ্গেও জটিল পরিস্থিতিতে মিলন ও মীমাংসা সম্ভব।"

বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান জেপি মর্গান'-এর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা পাম কম্পটন বলেন: "আজ আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের শিক্ষা সম্পর্কে জেনেছি। হযরত খলীফাতুল মসীহর ভাষণ ছিল এক গভীর শিক্ষা। আহমদীয়া মুসলিম জামাত সমগ্র বিশ্বের শান্তির পতাকাবাহী, সেবার মহান প্রেরণায় উজ্জীবিত। তারা সর্বদা মানবসেবায় প্রস্তুত এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।"

খ্যাতনামা চিকিৎসক ড. ফ্র্যাঙ্ক লাইভো স্পষ্টভাবে বলেন:

"আমি পূর্বে এই জামাত সম্পর্কে খুব বেশি জানতাম না, কিন্তু হযরত খলীফাতুল মসীহের ভাষণের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য মনোযোগ দিয়ে ভেবে দেখেছি এবং তা সত্য বলে পেয়েছি। তাঁর এই সতর্কবাণী- যে পৃথিবী তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে- সম্পূর্ণ সত্য। এই সতর্কবার্তা বিশ্বের সকল নেতার কাছে পোঁছানো উচিত। 'সবার জন্য ভালবাসা, কারো প্রতি ঘৃণা নয়'- এই চেতনাতেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।"

খ্রিষ্টান যাজক জন চেইস বলেন: "আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে হযরতের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়েছি। তাঁর ভাষণ ছিল প্রশংসনীয়। তিনি সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেছেন এবং সকলের সামনে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। "

মহানবী (সা.)-এর বাণী

"যে ব্যক্তি নিজ প্রভুকে স্মরণ করে সে জীবিতের ন্যায় এবং যে তাকে স্মরণ করে না সে মৃতের ন্যায়। সেই ঘর জীবিতের ন্যায় যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র (স্মরণ) করা হয় এবং যে ঘরে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করা হয় না সে ঘর মৃতের ন্যায়।" (বুখারী, কিতাবুত দাওয়াত)।

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

এবং যখন ভাগ-বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম এবং মিসকীনগণ উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকেও উহা হইতে দিও এবং তাহাদের সহিত ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিও। (আন-নিসা: ৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun,
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025 Vol-10 Thursday,23-30 Oct 2025 Issue No.43-44

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ওয়াকফাতে-নও ক্লাসের প্রশ্নোত্তর পর্ব

একজন ওয়াকফা নও প্রশ্ন করলেন-

"যখন ওয়াকফে নও ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন কি তাদের জন্য আবশ্যক যে তারা নিজেদের সন্তানদেরকেও ওয়াকফে নও স্কীমের অধীনে উৎসর্গ করবে?"

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: "এটি কোনোভাবে আবশ্যক নয় এবং এমন কোন বাধ্যবাধতা নেই যে তারা নিজেদের সন্তানদেরও ওয়াকফে নও প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করবে।"

আরেকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল: "যদি কোন ওয়াকফে নও সন্তানের পিতা-মাতা জামাত থেকে বহিষ্কৃত হন, তবে কি এর অর্থ এই যে তাদের সন্তানারও স্বাভাবিকভাবেই ওয়াকফে নও থেকে অব্যহতি পাবে?"

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: "হ্যাঁ, ঠিক তাই। যেসব পিতা-মাতা নিজেরাই উত্তম আদর্শ স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে- তারা কীভাবে তাদের সন্তানদের একজন আদর্শ আহমদী হিসেবে গড়ে তুলবে? তাদের সন্তানরা কীভাবে একটি সৎ ও উন্নত পরিবেশে বিকশিত হবে? তবে যদি ঐ পিতা-মাতা পরবর্তীতে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় জামাতের অন্তর্ভুক্ত হন, তবে তাদের ওয়াকফে নও সন্তানরা আমায় লিখে পুনরায় প্রকল্পর অন্তভুর্ক্তির জন্য আবেদন করতে পারে। এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিব, তাদের পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে কি না।"

আরেকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল: "তালিকায় ত্রিশটি পেশার উল্লেখ রয়েছে। এই পেশাগুলির মধ্যে কোনগুলো ওয়াকফাত-এ-নও (মহিলা সদস্য)-দের জন্য অধিক উপযোগী?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: তালিকাটি এই মুহূর্তে আমার সামনে নেই। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে আমি পছন্দ করি যে তারা চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রবেশ করুক, কোনো ভাষায় দক্ষতা অর্জন করুক, অথবা শিক্ষকতা, স্থাপত্য, ইতিহাস বা গবেষণার ক্ষেত্রে অগ্রসর হোক।"

আরেকিট প্রশ্ন: "একজন ওয়াকফা নও মেয়ের জন্য কি আবশ্যক যে সে কেবলমাত্র একজন ওয়াকফে নও ছেলের সঙ্গেই বিবাহ করবে?"

হুযুর আনোয়ার বলেন: "না, এটি আবশ্যক নয়। তবে কোন বিবাহ গোপনে সম্পন্ন করা উচিত নয়। ওয়াকফাতে-নও যে কোন আহমদী যুবকের সঙ্গে বিবাহ করতে পারে, যদি সে চরিত্রে উত্তম হয়। বিবাহের পরও তাদের উচিত ওয়াকফের চেতনা ও অঙ্গীকারের সঙ্গে কাজ করে যাওয়া।"

প্রশ্ন: "আমরা যখন আমাদের শিক্ষা সম্পন্ন করব, তখন কি আমরা সিঙ্গাপুরে কাজ করতে পারব, নাকি হুযুর আনোয়ারের নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করব?

হুযুর আনোয়ার উত্তর দিলেন: " আপনি যখন আপনার শিক্ষা সম্পন্ন করবেন, তখন খলীফাতুল মসীহকে লিখুন এবং তাঁর নির্দেশনার অপেক্ষা করুন। বরং আপনার শিক্ষাজীবনের মধ্যেই আপনি খলীফাতুল মসীহকে লিখে আপনার আগ্রহ ও অগ্রাধিকারসমূহ সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন।"

আরেকজন ওয়াকফা প্রশ্ন করেন: "আমরা কোন বয়সে সিদ্ধান্ত নিব যে ওয়াকফে নও পরিকল্পনার অধীনে আমাদের এই উৎসর্গ অব্যাহত রাখব কি না?"

হুযুর আনোয়ার বলেন: " যখন আপনি পনেরো বছর বয়সে পৌঁছবেন, তখন আপনার ওয়াকফ ফর্ম পূরণ করে স্থানীয় সেক্রেটারী ওয়াকফে নও-এর মাধ্যমে কেন্দ্রে প্রেরণ করুন। এরপর যখন আপনি শিক্ষা সম্পন্ন করবেন, তখন আবারও আপনার ওয়াকফের অঙ্গীকার পুনঃনিশ্চিত করুন এবং কেন্দ্রকে তা অবহিত করুন।

প্রশ্ন: "আমরা যদি আমাদের শিক্ষা সম্পন্ন করার পর সরকারি চাকরিতে যোগ দিতে চাই, তবে কি তা করা যাবে, যদিও আমরা ইতিমধ্যেই ওয়াকফ ফর্ম পূরণ করেছি?"

হুযুর আনোয়ার (আই.) উত্তরে বললেন: 'না, এমন অনুমান করা যাবে না যে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুমোদিত। কোন ধরণের কাজ শুরু করার আগে খলীফাতুল মসীহর অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক। কেবল তাঁর অনুমতি পাওয়ার পরই আপনি অন্য কোনো কাজে যোগ দিতে পারেন।"

মহানবী (সা.)-এর বাণী

"সর্বোত্তম যিক্‌র হল : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য (মা'বুদ) নেই "এবং সর্বোত্তম দোয়া হল আলহামদুলিল্লাহ্" অর্থাৎ, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার। (তিরমিযী, কিতাবুত দাওয়াত)।

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)**

(১ম পাতার শেষাংশ...)

সে তার উপর কর্তৃত্ব করে, স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, মানুষের জন্য এই সীমিত জীবন ছাড়াও এক উচ্চতর ও চিরস্থায়ী উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়েছে।

ইসলাম ঘোষণা করে যে, সেই উদ্দেশ্যটি হল, মানুষকে চিরন্তন জীবনের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং তার জন্য অবিরাম আত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অতএব, মৃত্যু কেবল এটাই বোঝায় যে আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে; আত্মা নিজে কখনো বিনষ্ট হয় না, বরং চিরকাল জীবিত থাকে এবং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যের অসীম স্তর অতিক্রম করে ক্রমাগত অগ্রসর হতে থাকে।

সুতরাং, নবীদের অস্বীকারের অন্যতম প্রধান কারণ- যেমন এই আয়াতগুলোতে ইঙ্গিত করা হয়েছে- হলো মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের অস্বীকার।

(তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৭১)

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

শূন্যপদ: ইলেকট্রিকাল সুপারভাইজার

বিভাগ: নিযামত তামীরাত,কাদিয়ান

প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা

প্রার্থীর বয়স: ১৮-৩০ (বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যতিক্রম বিবেচনা করা যেতে পারে)

প্রার্থীকে অবশ্যই ইলেকট্রিক্যাল ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট বা ট্রেড কোয়ালিফিকেশন যেমন কোন শিল্প প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বা কারিগরি বিদ্যালয় থেকে) অর্জন করে থাকতে হবে।

***প্রার্থীর একটি বৈধ ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজার লাইসেন্স থাকতে হবে।**

***প্রার্থীর অতিরিক্ত সার্টিফিকেট যেমন সেফটি সার্টিফিকেট, ফার্স্ট এইড/সিপিআর ট্রেনিং সার্টিফিকেট,এবং এইচভি/এলভি সুইচিং অপারেশনস সার্টিফিকেট থাকলে তা অগ্রাধিকার পাবে।**

***প্রার্থীর ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন, মেরামত বা প্রকল্পকাজে অন্তত দুই বছরের ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।**

***সুপারভাইজার বা লিড টেকনিশিয়ান পদে অন্তত এক বছরের অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক।**

***শিল্প-কারখানার ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেম, কন্ট্রোল প্যানেল,সুইচগিয়ার, পাওয়া ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম, ওয়্যারিং ও কনডুইট সিস্টেম-এ কজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইলেকট্রিশিয়ান বা টেকনিশিয়ানদের একটি দল পরিচালনার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।**

***প্রার্থীর ইলেকট্রিক্যাল কোড ও সেফটি স্ট্যান্ডার্ড সম্পর্কে গভীর ধারণা থাকা প্রয়োজন।**

***ইলেকট্রিক্যাল ড্রয়িং ও ব্লুপ্রিন্ট পড়া ও বুঝতে সক্ষমতা থাকা আবশ্যক।**

***ইলেকট্রিক্যাল সমস্যার ট্রাবলশুটিং সংক্রান্ত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।**

***প্রার্থীর ভাল যোগাযোগ দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী থাকতে হবে।**

***প্রার্থীকে শারিরীকভাবে সুস্থ, নৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে সৎ, ভদ্র ও মার্জিত আচরণসম্পন্ন হতে হবে, এবং সহকর্মীদের সঙ্গে সহনশীল ও নম্র আচরণ বজায় রাখতে হবে।**

গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী

১) সাপ্তাহিক বদর পত্রিকায় প্রকাশিত চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তির দুই মাসের মধ্যে প্রাপ্ত আবেদনগুলোই বিবেচিত হবে।

২) আগ্রহী প্রার্থীদের অবশ্যই নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে, যা তাদের জেলার আমীর/স্থানীয় আমীর/ জামাতের প্রেসিডেন্ট/ মুবাল্লিগ ইনচার্জের স্বাক্ষর ও সীলমোহরসহ প্রেরণ করতে হবে।

৩) সাক্ষাতকারে উত্তীর্ণ প্রার্থীকে নূর হাসপাতাল, কাদিয়ান-এ মেডিকেল টেস্ট করাতে হবে। শুধুমাত্র নূর হাসপাতালের মেডিকেল বোর্ড কর্তৃক সুস্থ ও সক্ষম ঘোষিত প্রার্থীরাই সেবার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে।

৪) কাদিয়ানে যাতায়াত ও চিকিৎসা সনদের সকল ব্যায় প্রার্থীকে নিজে বহন করতে হবে।

৫) সাক্ষাতকারের সময় মূল শিক্ষাগত সনদপত্র সঙ্গে আনা আবশ্যক।

দ্রষ্টব্য: সাক্ষাতকারের তারিখ প্রার্থীদের পরে জানানো হবে।

বিস্তারিত জানতে নিম্নোক্ত ইমেল ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করুন

Office: 01872-501130
Mobile: 9682587713, 9888232530, 9682627592
Email:diwan@qadian.in

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir